'দেবতার দান'

শ্রীজলধর সেন

১৩৩১। শ্রাবণ

আঠারবাড়ী

ময়মনসিংহ

উৎসর্গ-পত্র।

পরম স্নেহাশীর্ব্বাভাজন

শ্রীমান্ প্রমোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার,

আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ।

আয়ুষ্মন্!

অতীতের এমনি এক পুণ্যময় দিনে, যাঁহারা তোমায় লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে 'দেবতার দান' রূপে তোমায় পাইয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

আমার সত্যসন্ধ স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় দেবতার দ্বারে আরাধনা করিয়া ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের মত তোমারই বর্ত্তমান পিতৃমাতৃবংশের উদ্ধারকল্পে তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়া কৃতকৃতার্থ-চিত্তে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন

'দেবতার দান'।

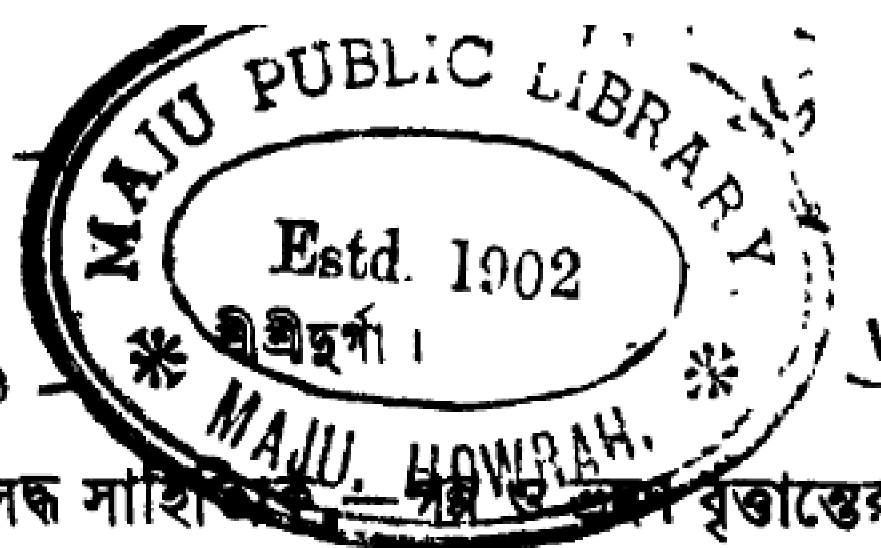
তদবধি আমরাও তোমাকে 'দেবতার দান' স্বরূপেই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমি সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে তোমারি আশ্রয়ে যে কিছু সত্য 'দেবতার দান' রূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি, আমার সেই সত্য,—সাধনার সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধি, 'দেবতার দান' তোমার হাতে তুলিয়া দিলাম;—দেবতার দানের নিকট এই ক্ষুদ্র

'দেবতার দান'

অনাদৃত হইবে না আশা করি। ইতি ১৩৩১। শ্রাবণ।

আঠারবাড়ী। নিয়তাশীর্ব্বাদক

ময়মনসিংহ। শ্রীকালীকৃষ্ণ শর্ম্মা।



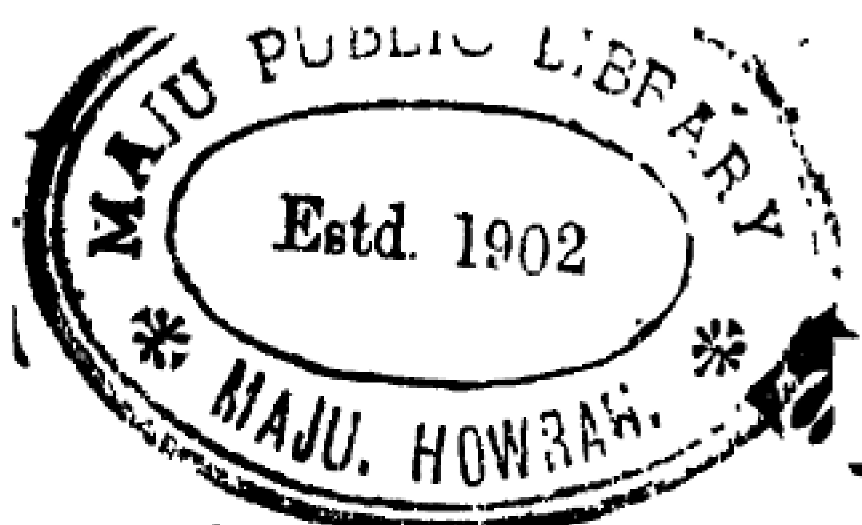
বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক,—গল্প ও ভ্রমণ বৃত্তান্তের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর,—মহাশয়ের লিখিত-

ভূমিকা

"দেবতার দান" গল্প পুস্তক ; লেখক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,—খাঁটী হিন্দু, শাস্ত্রাধ্যাপক—। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মধ্যে অবকাশ সময় ছোট গল্প লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর সুলেখক সুবক্তা পণ্ডিত মহাশয়ই আমাকে দিয়াছেন ; তিনি বলেন ধর্ম্মোপদেশ কার্য্যকারী ও গ্রহণীয় করিতে হইলে সম্মুখে আদর্শ উপস্থাপিত করিলে অধিকতর ফল হয়, সুতরাং পণ্ডিত মহাশয় গল্প লিখিয়া অশাস্ত্রীয় কাজ করেন নাই ;—বিজ্ঞ-বহুদর্শী-অধ্যাপকের উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত গল্পগুলি আমি পড়িয়াছি—বিশেষ মনোযোগ সহকারেই পড়িয়াছি। ইহাতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতি ভাষার নাম গন্ধও নাই ; আছে সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য,—আছে—সত্যের প্রতি অটল শ্রদ্ধা,—আছে—ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা,—আর আছে—দুঃস্থের প্রতি প্রাণভরা সহানুভূতি। ইহার অধিক ও আর কিছু প্রার্থয়িতব্য আছে কিনা, আমি জানি না।

শ্রীজলধর সেন।



দেবতার দান।

(১)

শ্রীমন্তপুরের প্রাচীন ঘরে শিরোমণি মহাশয় শেষ পণ্ডিত। শিরোমণি মহাশয় গুরুতা ব্যবসায়ী, স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ। পৈতৃক জমাজমি তালুক ও নগদ টাকার পরিমাণ সামান্য হইলেও মোটের উপর তাহা তখনকার দিনে একরূপ মন্দ ছিল না। তা ছাড়া শিরোমণি মহাশয়ের নিমন্ত্রণের বিদায়ের আয়ও প্রচুর ছিল।

শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে পৈতৃক আমলের দেবতা বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, শালগ্রাম শিলা, পিতলের দশভুজা, এবং পাথরের মদনমোহন বিগ্রহের নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপূজা শিরোমণি মহাশয় নিজে সম্পাদন করিতেন। প্রতিদিন নিয়মিত ভোগ হইত, গৃহিণী ঠাকুরাণী স্বয়ং ভোগ পাক করিতেন, শিরোমণি মহাশয় নিত্যপূজার পরে ভোগ লাগাইয়া পাঁচ সাত জন পড়ুয়া সহ পুত্রপৌত্রাদি লইয়া একত্র আহার করিতেন। নিত্য ভোগের আয়োজন প্রচুর ছিল না, কিন্তু তবু সকলে সানন্দচিত্তে একত্র হইয়া তাহা দ্বারাই মধ্যাহ্নের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন, রাত্রে প্রায়ই মাছের ঝোল তরকারী পাক হইত, রাত্রের রাঁধা বাড়া পুত্রবধূগণ সম্পন্ন করিতেন। শিরোমণি মহাশয় একবেলা নিরামিষ খাইতেন, রাত্রে দুধ এবং কলা বা অন্য কিছু ফল আহার করিতেন।

শিরোমণি মহাশয়ের বয়স সত্তর কি পচাত্তর হইবে। এই বয়সেও তাঁহার শরীরটী বেশ নীরোগ বলিষ্ঠ; দাঁত একটীও পড়ে নাই, মাথাটী পাকিয়া তুষারশুভ্র হইয়া গিয়াছে—তবু সর্ব্বাঙ্গে পুণ্যের ও স্বাস্থ্যের একটা তরল জ্যোতিঃ সর্ব্বদা বিচ্ছুরিত হইতেছে। গৃহিণী ঠাকুরাণীর দেহেও পূর্ণ স্বাস্থ্য বিদ্যমান, চুল একটীও পাকে নাই, দাঁত একটাও নড়ে নাই, সিঁথিভরা সিন্দূরের মোটা রেখা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে,—গৃহিণীর হাতের শাঁখা জোড়া একেবারে হাত দুখানি জুড়িয়া বসিয়াছে, লক্ষ্মীর প্রসাদ নির্ম্মাল্য যেন দেবীর দেহে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে।

শিরোমণি মহাশয়ের পরিবারে সকলেই সুখী, সকলেই 'গৃহ দেবতার' প্রসাদে ও আশীর্ব্বাদে নিজেদের জীবন সর্ব্বদা পূত ও রক্ষিত মনে করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে সংসার করিতেছেন। তবে একটা দুঃখ এই পরিবারের প্রায় সকলের মনেই অল্পাধিক পরিমাণে ছিল, তাহা অন্য কিছু নহে, শিরোমণি মহাশয়ের অভাবে এই সাত পুরুষের পণ্ডিতের বাড়ীটা পড়িয়া শূন্য হইবে। হায় হায় তখন শুধু এই বাড়ীটার কেন এই গ্রামের শ্রীটাই বা কেমন 'বিতিকিচ্ছি' দেখাইবে, কথাটা ভাবিয়া শিরোমণি মহাশয় অনেক সময় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। গ্রামের ও কেহ কেহ এই নিয়া অনেক সময় আলোচনা করিত। সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্যথাটা গ্রামের মধ্যে বেশী করিয়া লাগিত, রামগোপাল ঘোষকে।

রামগোপাল বাবু বর্ত্তমানে কয়েক মাসের বিদায় লইয়া গ্রামে বাস করিতেছেন, তিনি তখনকার দিনের সিনিয়ার পরীক্ষা পাশ করিয়া জজ্‌সাহেবের সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন, জজ্‌সাহেবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করিতেন, রামগোপাল বাবু শ্রীমন্তপুরের সম্পন্ন গৃহস্থ, জমাজমি ও তালুক মুলুকের তাঁহার অভাব ছিল না, তিনি সেরেস্তাদারি করিয়াও বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছেন।

শিরোমণি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পিতার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল, সেই সূত্রে রামগোপাল বাবুকে শিরোমণি পরিবারের সকলেই পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিত, শিরোমণি মহাশয়ও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইদানীং রামগোপাল বাবুর পরামর্শ ছাড়া শিরোমণি মহাশয় কোনও কার্য্য করিতেন না।

রামগোপাল বাবু ধার্ম্মিক সদাচার সম্পন্ন কায়স্থ সন্তান, তাঁহার চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ। এই রামগোপাল বাবুই প্রথমে যখন সেরেস্তাদার হইয়া শ্রীমন্তপুরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে শিরোমণি মহাশয়ের দেবতার দুয়ারে লুটিয়া পড়িলেন, তখন গ্রাম ভাঙ্গিয়া সকল মানুষ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে জড় হইয়াছিল,—আর 'ইংরাজী পড়া' রামগোপালের দেবতা ব্রাহ্মণভক্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল!

রামগোপাল বাবুকে পায়ের গোড়ার মাটী হইতে টানিয়া তুলিয়া লইয়া শিরোমণি মহাশয় বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বন্ধুবর সীতারাম ঘোষের জন্য অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছিল তাহারা আজিও ভুলে নাই। রামগোপাল বাবু পিতৃ-

স্থানীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহণীয় সম্পৎ বলিয়া মনে করিতেন। যাহা হোক্ রামগোপাল বাবু যখন কিছু-কাল পরে সহরে রোওয়ানা করিলেন, তখন গ্রাম বাসিগণ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—তাঁহার সঙ্গে শিরোমণি মহাশয়ের মধ্যম ও ছোট পুত্র উরফে জয়কালী ও রামকালী ভট্টাচার্য্য ইংরাজী পড়িবার জন্য টোলের 'পাত্ তাড়ি' গুটাইয়া একেবারে উৎসাহদীপ্তমুখে দৃঢ়চিত্তে সহরের দিকে চলিয়াছে।

শিরোমণি মহাশয়ের টোলের মেধাবী ছাত্রের দু'টাই চলিয়া যাওয়ায় সকলেই একটু ক্ষুণ্ণমনাঃ হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃত্যকালী—একাকীই টোলে রহিলেন। তিনি ব্যাকরণ শেষ করিয়া ভট্টি, কুমার ও রঘুর কিয়দংশ পাঠ করিতেছিলেন,—নৃত্যকালীর পড়াশুনা বেশী হইত না, তিনি কিঞ্চিৎ দীর্ঘসূত্রী এবং শুচিবাতিকগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া প্রায় সর্ব্বদাই জলে গোবরে লুটাপুটি করিতেন, তাঁহার পাঠ ঢিমে তেতালায় চলিতেছিল,—আর একটা প্রধান কার্য্য তাঁহার এই ছিল যে তিনি সর্ব্বদাই গৃহদেবতার সেবাপূজার দিকে শ্রদ্ধাযুক্ত দৃষ্টিরক্ষা করিতেন, ফুল বেলপাতা দূর্ব্বা তুলসী নিজহাতে চয়ন করিতেন, এবং সে গুলি পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া লইতে পাঠের মূল্যবান সময়টা কাটাইয়া দিতেন, তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারে সকলেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একমত নিরাশ হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতা পিতার শ্রদ্ধা তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না, নৃত্যকালীর আস্তিকতা দর্শনে পরলোকবিশ্বাসী দম্পতী বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, তবে

জ্যেষ্ঠা বধূমাতা তাহাতে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না, দেবরদিগের ইংরাজী পড়ারগুণে সম্ভাব্যমান ভবিষ্যৎ সুখ সম্পৎ তাঁহাকে পীড়া না দিলেও অনেকটা নিজের চিন্তার দিকে টানিয়া লইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা বধূ নিজের স্বামী ও নাবালক পুত্র কন্যাগণের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির কোনও সুনিশ্চিত সম্ভাবনা না দেখিয়া মনে মনে অস্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনো স্বামীকে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার সাহস হয় নাই। শ্বশুর শাশুড়ীকেও স্বামীর প্রতি সমধিক স্নেহশীল দেখিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না, স্বামীর দ্বারা যে শ্বশুরের টোল রক্ষা হইবেনা, তাহা বুদ্ধিমতী বড়বৌ অনেকদিন হইতেই জানিতেন।

যাহা হোক্ কএক বৎসর পরে জয়কালী ও রামকালী ভট্টাচার্য্য ইংরাজী বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া সহরে চাকুরী লইলেন। শিরোমণি মহাশয় এইবার যথার্থই ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। শিরোমণি মহাশয়ের আদবে ইচ্ছাই ছিল না যে তাঁহার পুত্রগণ জাতীয় অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিখিবে। এবং সেই জন্যই তিনি তিনটী পুত্রকেই নিজের টোলে পড়াইতেছিলেন, পরে রামগোপালবাবু যখন ইংরাজী শিখিয়া জজের বাড়ীর সেরেস্তাদার হইয়া দেশে আসিলেন, এবং শিরোমণি মহাশয়কে বিশেষ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, তখন শিরোমণি মহাশয় রামগোপালের আদর্শে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত পুত্রদ্বয়কে তাঁহারই সঙ্গে সহরে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইংরাজী পড়িলেই লোকে খৃষ্টান হয়

না, দেবতা দ্বিজে ভক্তিও থাকে, অর্থাগমও হয় ; তথাপি প্রাচীন সংস্কার তাঁহাকে পদে পদেই বাধা দিতেছিল, শেষটায় পুত্রদ্বয়ের একান্ত আগ্রহে রামগোপাল বাবু জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই কিন্তু তিনি নৃত্যকালীর উপর গৃহস্থিত দেবতার ও পরলোকস্থিত পিতৃলোকের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছিলেন ; ক্রমে নৃত্যকালীর পাঠস্পৃহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়া শিরোমণি মহাশয় বাস্তুভিটার পড়ুয়ার ভার অর্পণযোগ্য কাহাকেও না দেখিয়া অনেকটা দমিয়া গিয়াছিলেন।

ইদানীং সেই পুত্র দু'টীও সহরে চোগা চাপকান্ আঁটিয়া চাকুরী করিতে চলিয়াছে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় নিজের বংশের বিশিষ্টধারা লোপের আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। তিনি সহসা নিদ্রোত্থিতের মত চারিদিকে চাহিয়া একমাত্র অক্ষম পুত্র নৃত্যকালীকেই বাস্তুভিটার উত্তরাধিকারীরূপে দেখিতে লাগিলেন— অজ্ঞাতে তাঁহার গণ্ডদ্বয় বাহিয়া ধারাস্রোতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ছেলেরা বিদেশে থাকিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতেছেন, মাসে মাসে প্রচুর টাকাও তাঁহারা পিতৃদেবের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিতেছেন, গৃহিণীর মুখ হাসিকান্নার মিশ্রণে অদ্ভুত মলিন। আর শিরোমণি মহাশয়ের মুখে হাসিত নাইই বরং গোপনে কান্নারই দাগ লাগিয়া থাকে।

কএক মাস হইল রামগোপাল ঘোষ দেশে আসিয়া শিরোমণি মহাশয়ের মুখ দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। এবং আরও

বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারই প্ররোচনায় বৃদ্ধ নিজের অনভিপ্রেত কার্য্য নিজেরই কতকটা অজ্ঞাতে সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইয়া আজ এই গূঢ় অনুতাপে তপ্ত হইতেছেন। এবং যোগ্য পুত্র দু'টীকে টোল ছাড়াইয়া স্কুলে নেওয়ার অপরাধে ইতঃপর শ্রীমন্তপুর যে টোল শূন্য হইয়া শ্রীহীন হইতে চলিল এই চিন্তা যেমন শিরোমণি মহাশয়কে বিঁধিতেছিল তেমনি ধর্ম্মভীরু রামগোপাল বাবুকেও ভারি উদ্বিগ্নকরিয়া তুলিয়াছিল। রামগোপাল বাবু সেই হইতে নীরবে কি যেন চিন্তা করিতেন।

এদিকে অলক্ষিতে শিরোমণি মহাশয়ের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ একদিন কলেরা রোগে শিরোমণি মহাশয় সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামগোপাল বাবুকে ডাকিয়া অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন এবং একখানি উইল সম্পাদন করিয়া তাহা চিরবিশ্বাসী রামগোপাল বাবুর হাতে রাখিয়া গেলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র নৃত্যকালীকে বলিয়া গেলেন কৃষ্ণকালী যেন তাহার পিতামহের টোল রক্ষা করে। কৃষ্ণকালী তখন সবে মাত্র বার বছরের ছেলে, এইটীই নৃত্যকালীর একমাত্র পুত্র, দু'টী মেয়ের বয়সও যথাক্রমে আট ও দশ বৎসর। গৃহিণী তখন গৃহদেবতার দুয়ারে লুটাইয়া সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। দেবতার দয়া হইল না, তিনি মরিতে পারিলেন না, সহরের চাকুরীজীবী পুত্রদ্বয় গৃহে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শিরোমণি মহাশয়ের প্রাণবিয়োগ হইয়া গিয়াছিল।

(২)

কিঞ্চিৎসমারোহে শিরোমণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। ছাত্র ক'টি চোখের জলে গুরুপত্নীর পা ধোয়াইয়া চিরদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেল। পড়ুয়াশূন্য শ্রীমন্তপুর নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল, রামগোপাল বাবু শিরোমণি মহাশয়ের বসত বাটীর অবস্থা দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের স্ত্রীর মানসিক অবস্থা যাহা হইল তাঁহা অন্তর্য্যামী ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিল না, বাহিরে তাঁহার পাণ্ডু রুক্ষ চেহারা দেখিয়া রামগোপাল বাবু তাঁহার জীবন সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা বড় বৌয়ের হাতে নিজ ঘরের এবং দেবতার ঘরের ভোগ নৈবেদ্যের কাজ সঁপিয়া দিয়া ইদানীং জপ তপস্যায় বিশেষ মনোযোগ করিলেন। সংসারের কথা বা কোন কাজে তিনি আর নাই।

বড় বৌ একা সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতেছেন, মেজ বৌ আর ছোট বৌ বড় বৌএর তাবেদারি করিয়া "রান্নাবান্না" করিতেছেন, জয়কালী ও রামকালী বাবু দস্তরমত মুরুব্বীআনা চালে, এই কয়দিন বাড়ীতে বাস করিয়া আবার কার্য্য স্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মেজবৌও ছোটবৌ নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের লইয়া স্বামীর অনুগমনে নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেও তাঁহাদের সম্মতির অভাবে আপাততঃ শ্রীমন্তপুরেই রহিয়া গেলেন। বুদ্ধিমতী বড়বৌ লক্ষ্য করিলেন—ছোট যা দুটীর

অপ্রসন্ন মুখ হইতে অজ্ঞাতে বিরক্তিব্যঞ্জকতীক্ষ্ণবাক্যসকল নির্গত হইতেছে। গৃহিণী কিছুই দেখিলেন না, বা কিছুই শুনিলেন না। তিনি নিজ মনে সন্ধ্যা পূজা করিতেন, আর আদরের নাতি "কৃষ্ণকালী" দ্বারা গৃহদেবতার সেবা পূজা করাইতেন।

কর্ত্তার মৃত্যুর পরে অন্য রকমের পরিবর্ত্তন সেই বাড়ীতে কিছু কিছু না হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু গৃহিণীর একান্ত যত্নের গুণে গৃহদেবতার সেবা পূজায় বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কৃষ্ণকালী পিতার নিকট ব্যাকরণ পড়িত, আর অবসর সময় ঠাকুরমার কাছে বসিয়া বসিয়া সেকেলে গল্প শুনিত,—নৃত্যকালী ভট্‌চায একবৎসর দেহাশৌচ লইয়া দেবসেবা করিতে পারিবেন না—তাই কৃষ্ণকালীকে সমস্ত পূজা-অর্চ্চা-বিধি-শিক্ষা দিয়া দস্তুরমত একটী সেবায়েত করিয়া তুলিয়াছেন।

ইতিমধ্যে রামগোপাল বাবু একদিন গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কর্ত্তার অভিপ্রায় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণকালীকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া পণ্ডিত করিয়া আনিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়াছিলেন—"না বাবা,—এক বছর পার হোক্,—দেহাশৌচ নিয়ে বাছা নেত্য,—দেবসেবা কর্‌তে পারবে না,—আমার 'কেষ্টদা,—কর্ত্তার মত তৈরি হয়ে উঠেছে এক বছর থাক্। আমি থাকতে যাকে তাকে ঠাকুর ঘর মাড়াতে দেবো না"—শুনিয়া রামগোপাল বাবু খুসী হইয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কর্ত্তার উইল



কিন্তু সাধারণের কাছে অপ্রকাশই রহিয়া গেল। বাড়ীর বধূগণ এই মাত্র জানিতেন—শিরোমণি মহাশয় মৃত্যুকালে একখানি উইল করিয়া গোপনে তাহা রামগোপাল ঘোষের হাতে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই উইলের মর্ম্ম তাঁহারা জানিতেন না। তবে ছোটবৌ আর মেজবৌ সময় সময় একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিতেন যে উইলের মর্ম্ম অবশ্যই তাঁহাদের দুজনের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। পরন্তু বড়ঠাকুর চক্রান্ত করিয়া ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা কর্ত্তাকে বাধ্য করিয়া উইলটী করাইয়াছেন,—শাশুড়ী ঠাকুরাণীও তলে তলে না ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যাহাই থাক্ সময়ে প্রকাশ হইবেই। আস্‌মানে চাঁদ উঠিলে সকলেই দেখিবে! তবে কিনা শ্বশুর শাশুড়ী এক কাট্টা হইয়া পেটের ছেলেদের এমনতর ঠকাইয়া যাইতে ভবসংসারে আর দেখা যায় নাই—বরাত, বরাত!—

শিরোমণি মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পরে রামগোপাল বাবু একদিন জয়কালী ও রামকালী বাবুকে একত্র করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভায়া তোমাদের বড়দাকে ডাক,—আমি কর্ত্তার উইলখানি তোমাদের তিনজনকে বুঝিয়ে দিয়ে খালাস হই।" তখন দু'জনেই বলিয়াছিলেন,—"সেকি গোপাল দা, আপনার কাছে বাবা উইল রেখেছেন, তা আবার আমাদের দেখিয়ে কি হবে!—যখন যা উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন, তাই দেবেন, আমরা পালন করে যাবো। আর বড়দাই'ত বাড়ীতে রইলেন।"

ইহার পর উইল নিয়া আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। জয়কালী ও রামকালী বাবু মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছিলেন।—বড়কর্ত্তা এখন বাড়ীর কাজকর্ম্ম করেন, ঘরে বড়বৌ সকল দিকে সমান তালে পা ফেলাইয়া গৃহস্থালী করিয়া থাকেন, ছোট বৌ ও মেজবৌ একটু বাবু ধরণের মানুষ, তাঁহারা গৃহস্থালীর কাজে মন দেখা গোছের তাবেদারি করিয়া বড়বৌকে খুসী করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বড়বৌ তাহা বুঝিতে পারিয়াও অতিরিক্ত রকমের সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেও ভুলিতেন না। বড়বৌ জানিতেন, ইহারা দু'টীই একটু সুখান্বেষী, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েগুলি লইয়া তেমন পারিয়া উঠে না,—আহা থাক্ থাক্—দু'দিন একটু সুখে থাক্, আবার কোন দিন ঠাকুরপোদের ডাক্ আসে, কোন দূর দেশে চলিয়া গেলে বেচারীদের ছেলে মেয়েগুলি লইয়া বিদেশে কত কষ্টই না হইবে।

বড়বৌ ইদানীং 'যা'দের প্রতি আরও স্নেহশালিনী হইয়া উঠিলেন, তাহাদের ছেলে মেয়েগুলিত জ্যেঠাই মা ছাড়া কিছু জানেইনা। ভাত খাওয়ান, দুধ খাওয়ান, সময় মত শোয়ান, কাহিলে কাতরে ঔষধ পথ্য যোগান, সমস্তই তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল, কোন্ শিশুটী ধার দুই হাঁছিল,—কোনটী বা পাতলা বাহ্যে করিল, এসকল তদন্ত করিয়া তাহাদের জননীদের স্নানাহারের বিধি নিষেধও তাঁহাকেই বাত্লাইতে হইত। এ সকল কারণে 'যা'গণ প্রকাশ্যে তাঁহার অত্যন্ত

আনুগত্য করিতেন,—এবং তাঁহার সাহায্য সর্ব্বপ্রকারে গ্রহণ করিয়া স্বস্তিবোধ করিতেন।—বড়বৌ উপার্জ্জনশীল দেবরদিগের ব্যবহারের কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে আশা ও উৎসাহে বিশেষ শক্তিশালিনী হইয়া উঠিলেন, এবং সেই শক্তিবলেই—'যা'দিগের প্রতি কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রাপ্য স্নেহ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া বুকদিয়া সকল কাজ করিয়া যাইতেছিলেন, ছোট 'যা'দের সাময়িক বিরক্তি বা কটূক্তি গ্রাহ্যই করিতেন না।—কিন্তু উইল সম্বন্ধে 'যা'দের নিভৃত আলোচনার কিয়দংশ হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইয়া স্বামীকে উইলের বিবরণ বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে স্বামী বলিয়াছিলেন—উইল সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। 'মা' ও 'গোপালদা' জানেন। শুনিয়া বড়বৌএর মন অনেকটা পাতলা হইয়া গিয়াছিল।

এম্‌নি করিয়া শিরোমণি মহাশয়ের পরিত্যক্ত সংসার চলিতেছিল। কিন্তু ছোটবৌ আর মেজবৌএর হৃদয়ে উইলের গোপন মর্ম্ম নানা আকারে আশঙ্কা ও বিভীষিকার তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া—সেখানে একটী ধ্বংশকারী বজ্রনির্ম্মাণের আয়োজন করিতেছিল, বুদ্ধিমতী বড়বৌ আশা ও আনন্দের হিল্লোলে হিল্লোলে—চলিতে চলিতে ও মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আশঙ্কায় থমকিয়া দাঁড়াইতেন ;—সরলচিত্ত স্বামী অক্লান্ত শ্রমে সংসার গুছাইতেছিলেন,—শাশুড়ী দেবতার সেবায় ও জপ তপস্যায় আত্মহারা, পুত্র দেবসেবায় মত্ত,—সুতরাং কেহ দেখিল না বা কেহ বুঝিল না, কোথা কি গলদ!—

(৩)

দেখিতে দেখিতে ছয়মাস কাটিয়া গেল, শিরোমণি মহাশয়ের ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ সংক্ষেপে হইয়া গেল। অনেক লেখালেখি সত্ত্বেও জয়কালী ও রামকালী বাবু বাড়ীতে আসিতে পারিলেন না, সরকারী কাজের নাকি বড় ভিড় ছিল। রামগোপাল বাবু সদরে পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও আসিতে পারিলেন না, পুত্রদ্বয় শ্রাদ্ধের টাকা পাঠাইয়াছিলেন শুনিয়া গৃহিণীর চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল, আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিয়া—জীর্ণ বুকটা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "কর্ত্তার শ্রাদ্ধে ও টাকা খরচ করবার দরকার নেই," শুনিয়া হতবুদ্ধি নৃত্যকালী ভট্চায মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধার কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু দুটি জ্বলিতেছে, কপালে ঘর্ম্ম বিন্দু ভ্রূযুগল কুঞ্চিত এবং নাসারন্ধ্র ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হইতেছে। মাতার ক্রোধ এবং সংকল্পের দৃঢ়তা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইয়া বড়কর্ত্তা একেবারে মহাব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জননী একটু হাসিয়া মালাদানিতে হাত দিলেন .এবং পাঁচখানি সিক্কামোহর বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, "এই দিয়ে—শুধু এরি মধ্যে কর্ত্তার শ্রাদ্ধ কর্ত্তে হবে। যাও"।—জননী জপে বসিলেন, সে দেশে এমন কেহ ছিল না, যাহার অনুরোধে বৃদ্ধার সংকল্পের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং পুত্র খানিকক্ষণ গৃহ দেবতাব দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া দরজার ধূলি কপালে মাখিয়া

মোহর গুলি তুলিয়া লইয়া তাহা দ্বারাই পিতার ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ কোনওমতে সম্পন্ন করিলেন।

নৃত্যকালী ভ্রাতৃযুগলের নামে সকল কথা খোলাসা জানাইয়া পত্র লিখিলেন, রামগোপাল বাবুকেও লিখিলেন। মাতৃদেবীর আকস্মিক চিত্তপরিবর্ত্তনের সঙ্গত হেতু অনুসন্ধান করিয়াও ঠাহর করিতে না পারিয়া নৃত্যকালী একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রামগোপাল বাবুকে সত্বর দেশে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়াই রামগোপাল বাবু বুঝিলেন পণ্ডিতগৃহিণী কোন যায়গায় কিসে আঘাত লাগিয়াছে। পুত্রদ্বয় পত্রের উত্তরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন দুই সপ্তাহ পরে ছাড়া কিছুতেই তাঁহাদের দেশে ফিরা সম্ভবপর নহে। রামগোপল বাবু দেশে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন।

এদিকে বৃদ্ধার কঠোর ব্যবহারের কথাটা কোথাও আর গোপন রহিল না। বাড়ীর স্ত্রীলোক মহলেও কথাটা নানা আকারে প্রচারিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না বলিয়া, কারণটা অনিশ্চয়ের ঘুর পাক খাইতে খাইতে এক এক জায়গায় এক এক রকম আকারে আত্ম-প্রকাশ করিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে যে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিল, সকলেই দৃঢ়তার স্বরে জানাইয়া দিতে ভুলিল না যে এই সিদ্ধান্তই সত্য এবং বিশেষরূপে পরীক্ষিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্ট, কিন্তু বুদ্ধিমতী বড় বৌ কোন কথার জবাব দিলেন না বা স্বামীকেও



কোন কথা বলিতে প্রশ্রয় দিলেন না। কৃষ্ণকালীর মুখ আগে হইতেই বন্ধ ছিল। সেত বুঝিতেই পারিয়াছিল, ঠাকুর মা, কত দুঃখে এমন কাজটা করিয়াছিলেন।

শ্বশুরের শ্রাদ্ধে আপন আপন স্বামীর দেওয়া টাকাগুলি এমন ভাবে ফিরাইয়া দেওয়ায় অপমানের আঘাতটা ছোটবৌ আর মেজবৌএর বুকের অনেকটা স্থানে গভীর ক্ষত করিয়া দিল। এমনি দৈবের চক্র,—প্রত্যহ সেই কথারই ব্যক্ত অব্যক্ত সমালোচনার খোঁচাগুলিও যাইয়া আবার তাহাতেই এক একটা ঘা মারিয়া আসিত। ফলে সেই ক্ষত সহসা শুকাইতে ছিল না, বরং নিজে বাড়িয়া বাড়িয়া যন্ত্রণাও বাড়াইয়া দিতেছিল। বড় বৌ লক্ষ্য করিয়া প্রমাদ গণিলেন, নিজের দেহের দিকে না তাকাইয়া 'যা'দের খিদ্মতে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু এ যাত্রা কিছুতেই কিছু হইয়া উঠিতেছিল না। দুটি 'যা' কোমর বাঁধিয়া বড় 'যা' ও বড় ঠাকুরের বিরুদ্ধে নানারকম দোষের আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। লোকে বলে যত্ন কখনও নিষ্ফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও ছোট ও মেজবৌএর যত্ন কতকগুলি অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া সার্থকতা লাভ করিল, সেই সত্যগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটী এই—

১ম—কর্ত্তার উইলখানি ছোট ও মেজ বাবুকে ঠকাইবার জন্যই যে বড় বৌএর পরামর্শে বড় কর্ত্তার চক্রান্তে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আগে কতকটা সন্দেহ থাকিলেও বর্ত্তমানে আর তাহা নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।



২য়—শাশুড়ী ঠাকুরাণী যে তাঁহাদের বিশেষ ভাল বাসেন না, তাহারও মূলে বড় বৌএর চক্রান্ত বিদ্যমান। শাশুড়ীর হাতের গুপ্তধন ও তাঁহার গহনাগুলি গোপনে হাত করিবার মতলবেই মাগ ছেলে ও সোয়ামীতে মিলিয়া বুড়ীকে সেবাশুশ্রূষা ও ন্যাকামি ইত্যাদি দ্বারা একেবারে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছে। এবং তাহারই ফলে বুড়ী অন্য ছেলেদের দুচোখে দেখিতে পারে না; দিনরাত বিষ ঢালিতে ঢালিতে বুড়ীর মন এমন থাপ্পা করিয়া তুলিয়াছে যে ছেলেদের টাকাগুলি পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিল!—আর কেমন মজা বুড়ীর টাকাতে কর্ত্তার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল; এদিকে প্রেরিত টাকাগুলি বড় বৌর সিন্দুকে জায়গা লইল! ওঃ! কি চক্রান্ত!

৩য়—যেমন করিয়াই হোক্ বাস্তুভিটা হইতে তাহাদের তাড়াইবার জন্যই যে এসকল চক্রান্ত তলে তলে হইতেছে তাহাতে এখন ছোট বৌএরও সন্দেহ রহিল না। মেজ বৌত রাম না জন্মাইতেই রামায়ণ গাহিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে।

তবে কিনা সন্দেহটা এখনো এই রহিয়া গেল যে ঘোষ মহাশয় এমন এক-চোখ হইয়া গেলেন, বড়বৌএর কোন মন্ত্রে, সেই মন্ত্রটা একবার পাইলে হইত!

নৃত্যকালীর পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই মেজবৌ সুবিস্তৃত পত্রদ্বারা সমস্ত বিবরণ ময় টীকাটিপ্পনি—স্বামী ও দেবরকে জানাইতে অবশ্যই ভুল করিলেন না। মেজবৌ আরও দুই একবার পত্র দ্বারা

বাড়ীর অবস্থা এবং মন্তব্য জানাইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু সুফল হয় নাই, বরং মেজবাবু ধমক দিয়া চিঠি লিখিতেন, তবে ফরমাস্‌গুলি যথাযথভাবে তামিল করিয়া এক এক সুট্‌ অতিরিক্ত বড়বৌ বা তাঁহার সন্তানদের জন্যও পাঠাইতে বিস্মৃত হইতেন না। মেজ বৌ ভাবিতেন—'কি গেরো'!

কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধের টাকাটা মা যে এত সহজেই ফেরত দিয়া দিলেন,—তাহাতে মেজ বৌএর অনুমান অনেকটা সত্য বলিয়াই তাঁহারা মনে করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারাও এমন কোন অপরাধ দেখিলেন না, এমন কোন সঙ্গত হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না, যাহাতে মাতাঠাকুরাণীর এমন ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। তবে—তবে কি বড়দাই মাকে অন্য রকম বুঝাইয়া এমন একটা কাজ করাইয়া লইলেন? কেন? কে জানে!—যাক!—এবার পত্রের উত্তরে ধমক না খাইয়া একটু প্রশংসার ইঙ্গিত পাইয়া মেজবৌ একেবারে ফুলিয়া উঠিলেন।—তিনি এখন কথায় কথায় কাঁদিয়া ফেলেন, দুবেলা প্রায় খাওয়াই হয় না, অকারণ ছেলে মেয়েদের পিঠে কীল চড় মারিয়া তাহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন!

ছোট বৌটী অপেক্ষাকৃত সরলা কিন্তু মেজবৌটী তাঁহাকে শিখাইয়া শিখাইয়া একটী 'বোকাশেয়ান' গোছের তৈরি করিয়া তুলিয়াছেন, ছোট বৌটী এখনই আপনার মতলবটী বুঝিতে পারেন বিলক্ষণ, এবং পরিপক্ক বুদ্ধির অভাবে ষোল আনার জায়গায়

আঠারো আনার দিকেই ঝোঁক দিয়া বসেন বেশী, কাজেই পদে পদে ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত হন। তবে মেজ বৌ কাণ্ডারী থাকায় ছোট বৌ ডুবিতে ডুবিতেও 'পাড়ি জমাইয়া' দিতে পারেন। ইদানীং মেজবৌ সুর ধরিলেই ছোট বৌ আসিয়া পোঁ ধরিতেন, আর ছোট বৌকে দিয়া সুর ধরাইয়া মেজ বৌ নিজ হইতেই তাল ঠুকিয়া যাইতেন, দেখিতে দেখিতে কয়দিনের মধ্যেই বাড়ীটার শ্রী কেমন লক্ষ্মীছাড়া গোছের হইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী আর পারিলেন না, একেবারে শয্যা লইলেন, তাঁহার প্রত্যহ রাত্রে জ্বর হইতে লাগিল, এখন আর শরীরে রক্ত নাই বলিলেই হয়। আহারে রীতিমত অরুচি ধরিয়াছে। এখন আর পুকুরে যাইয়া স্নান করা ঘটিয়া উঠেনা। বড় বৌ দুকলসী জল আনিয়া দেন তাহাতেই স্নান আহ্নিক শেষ করিতে হয়। জল গরম করিয়া দিবার কথা বলিলে আবার রাগ করেন। একেত জ্বরকে আমল দিবার অভ্যাস কোন দিনই নাই, তদুপরি মানসিক ব্যথায় মেজাজও যেন কেমন খিট্‌ খিটে হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণকালী অক্লান্ত শ্রমে এবং অশ্রান্ত শ্রদ্ধায় ঠাকুরমার ও গৃহদেবতার সেবা পূজা চালাইয়া যাইতেছিল। বালকের প্রাণে এমন তৃপ্তি, বৈচিত্রবিহীন একই রকমের কর্ম্মে এমন শ্রদ্ধা কোথা হইতে আসিল ?—

(২)

"বড়দিদি কিছু ধার দেবে?"—বলিয়া ছোট বৌ মুখ নীচু করিলেন। যেন সবটা বলিতে যাইয়া কোথাও আট্‌কা পড়িয়া গেল। বড়দিদি কিন্তু কথার শ্রী শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"সে কি বোন্ তোদের টাকা তোরা নিবি তার আবার ধার কিসের লা?—কেন? টাকার কি দরকার হলো?"

ছোট বৌ কি যেন বলিতে যাইয়াও বলিতে পারিলেন না, সংক্ষেপে বলিলেন, "খোকার একটা জামা চাই!"

"তবু ভাল—এই না বাণ্ডিল বাঁধা জামা কাপড় বাড়ী শুদ্ধ সকলের এলো সে দিন?" শুনিয়া ছোট বৌ মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন দেখিয়া বড় বৌ একটু হাসিয়া বলিলেন "চোপর দিনের জন্য একটা হাল্‌কা জামা চাই বইকি বোন্!" ছোট বৌ আবার বলিলেন "হ্যাঁ বড় দিদি তাই দুটা টাকা ধার দাও!"

"ধার?" তবু তুই ধারই বল্‌বি? তোর সোয়ামী কামাই করে পাঠাচ্ছে আর আমরা বসে বসে খাচ্ছি বইত নয়?"

সহসা ঘরখানি একটা পৈশাচিক হাস্যে কাঁপাইয়া তুলিয়া মেজ বৌ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বৌএর বুকটা ও মুখখানি এতটুকু করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন "মিথ্যে কথা দিদি, মিথ্যে কথা, ওঁর সোয়ামী 'কসাইগিরি' করে টাকা পাঠায় ও টাকা তোমরা খাবে কি স্পর্শও করোনা, আর তোমাদের পুণ্যির সংসারে থেকে ওঁই কি ও পাপ টাকা ছুঁতে পারে? তাই ধার চাচ্ছে কেমন লা ছোট?"

ছোট বৌ মধ্য সমুদ্রে একখানি আশ্রয় পোত পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, "তা বৈকি দিদি! ভিটেয় পড়ে আছি দুমুঠো না খেয়ে বাঁচিনে তাই গিলি,—কামাই টামাই কি জানি দিদি?"

বড় বৌ কিন্তু ভঙ্গ দিবার রাস্তা খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু রাস্তা তখন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তিনি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছিলেন!

মেজ বৌ কহিলেন—"তুই বুঝি ওঁর পুণ্যির সংসার থেকে দুটাকা ধার চাচ্ছিস্? তা চাইবি বৈকি বোন্! আজ থেকে আমিও চাইবো, আমাদের ওঁরা যে কসাই!"—

বড় বৌএর দু'চোখে জল বাহির হইতেছিল তিনি কি যে বলিবেন, কি যে করিবেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মেজ বৌএর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া রহিলেন, মেজ বৌ খলস্বভাবা হইলেও তাঁহার প্রাণে একটু দয়া আসিল, যদিও এই দয়াটা বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর মরণাহত শেষ চাহনি দেখিয়া বুকের বাণটা একটানে উপড়াইয়া তুলিয়া লইবার জন্য ব্যাধ হৃদয়ের দয়ারই অনুরূপ!—মেজ বৌ একটু নরম সুরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন,—"তা দিদি মনে কিছু করোনা—ও এখন আর তেমন ছোটটী নয়, আপনার ভাল মন্দ না বুঝে এমন নয়, তা আপনার ভাল মন্দ বুঝতে গেলেই তো বন্ধু বেজার!—কলিকাল কিনা দিদি, কলিকাল! তা দিয়ে দাও ওকে দুটো টাকা, আসছে

মাসে শোধ দিয়ে দেবে। ওলো ছোট, তোর সোয়ামীকে লিখে দে না হয় কোথাও ঠাকুর পূজো টুজো করে দুটো টাকা পাঠিয়ে দেয়, তার কসাইগিরির টাকা কিন্তু বড়দি ছোবে না।" মেজ বৌ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন হাসির ধাক্কাগুলি বড় বৌএর বুকের মধ্যে তীরের মত বিঁধিতেছিল।

বড় বৌ এতক্ষণ নীরবেই ছিলেন এইবার নরম স্বরে কহিলেন, "তোরা বোন্ আমাকে যা বলিস্ বল, কিন্তু 'মা'কে খেঁাচা দিয়ে কথা বলা কি আমাদের সাজে ভাই? মা শুন্‌লে কি ভাব্‌বেন?"

মেজ বৌ আবার হাসিলেন, ছোট বৌ একটু ভীত হইয়া মাটীর দিকে তাকাইলেন, মেজ বৌ গলা একটু চড়াইয়া বলিলেন,— "ধর না দিদি একের নম্বর মা শুনেইছেন! আর শুনে তিনি কি ভাব্‌বেন তাও আমাদের কারুর জানতে বাকি নেই!—আর সব চাইতে আমার দুঃখ এই যে এই বাড়ীতে মা'র নাম করে করে যার যার খুসী মাফিক সকল কাজ বরাবর চালিয়ে নিতে কেউ একটু কসুর কর্চ্ছেনা! অথচ মার চোখে এম্‌নি একটা ঠুলি আঁটা যে সে বেটী তার নিজের আক্কেলের এক গাছি চুলও দেখ্‌তে পাচ্ছেনা!" বড় বৌ দ্বিগুণ আহত হইয়া বলিলেন "মেজ বোন্! যাঁদের লক্ষ্য করে তুমি এ সকল মিথ্যে কথার খোঁচা দিচ্ছ, তাঁরাও যে বোন্ তোমার গুরুজন। সকলকে এক সঙ্গে অপমান করবার জন্য তুমি কি বোন্ আজ 'জেদ' করে

বিছানা ছেড়েছ ?" বড় বৌ আর বলিতে পারিলেন না কাঁদিয়া ফেলিলেন, মেজ বৌ একটু মুচ্কি হাসিয়া বিজয়ের গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া এক পা দুই পা করিয়া সরিয়া যাইতেছিলেন আর বলিতেছিলেন "মাপ কর দিদি, কসাই গিন্নির মুখ আর কত ভাল হবে !—তবে কি জান দিদি বড় দুঃখেই কথা ক'টা বল্লুম—বুকে হাত দিয়ে দেখো, অপ্রিয় হলেও কথাগুলো সত্য !"

ছোট বৌ মেজ বৌর অনুসরণ করিলেন। বড় বৌ চৌকির উপরে মুখ লুকাইয়া—শুইয়া শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া লইলেন।

ঝড়ের পরে শান্ত প্রকৃতির মত ঘর খানি শান্ত স্থির, কিন্তু বড় বৌএর হৃদয়ের মাঝে দারুণ ঝড় বহিতেছিল। তিনি এত করিয়া সংসারের জন্য খাটিয়া মরিতেছেন, সকলকে তুষ্ট রাখিবার জন্য নিজের সুখ শান্তির দিকে এক নজরও চাহেন না। 'যা'দের ছেলেমেয়েরা সুখে স্বচ্ছন্দে আহারাদি করিয়া উদ্বৃত্ত যাহা থাকে, নিজের ছেলে মেয়েদের মুখে তাহাই অতি তৃপ্তির সহিত তুলিয়া ধরিতেছেন, তবু সরিকি ধরনে চলিবার সাহস হইতেছিল না, যেহেতু স্বামী সমর্থ নহেন, সন্তানও উপার্জ্জনে অক্ষম, যাঁহারা কামাই করিয়া দু'পয়সা আনেন, তাঁহাদের পরিবারের দাবি সকলের আগে পূরণ করা আবশ্যক, নতুবা মিলিত সংসার বেশীদিন টিকিবে না, আর যদি নাই টিকে, তবে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট যে বড়বৌর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে, বুদ্ধিমতী বড়বৌ তাহা বুঝিতেন। ছোট 'যা' দুইজন, একে আর বুঝিয়া সংসারটাকে মাটি করিতে বসিয়াছেন। বড়বৌ আজ বেশ

বুঝিতে পারিলেন--তার এই সংসারটা টিকিবে না, তবে নিজেদের ভাগ্যে যেমনই হোক্ বৃদ্ধা শাশুড়ীকে পারের ঘাটে বসিয়া অপমান সহিতে না হয়,—হা ঠাকুর, তোমার সেবা পূজা করিয়া যদি বড়বৌর স্বামী পুত্র এতটুকুও পুণ্য করিয়া থাকেন, তবে সেই পুণ্যের ফলে এইটুকু কর দেবতা, বৃদ্ধা শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে যেন এই পরিবারের শোচনীয় দুর্ঘটনা তাঁহাকে স্পর্শ না করে। সংসার ভাঙ্গে ক্ষতি নাই কিন্তু আরও কিছুদিন পরে। বড়বৌ অনেক কাঁদিলেন. তাঁহার কান্না বিশ্ববিধাতার সিংহাসন তলে পৌঁছিল কি না কেহ জানিতে পারিল না।

মেজবৌ যতবড় কুঁদুলেই হউন না শাশুড়ীর রুগ্ন শয্যার পাশে যাইয়া এসকল কথা শুনাইয়া দিবার মত সাহস আজও জন্মে নাই। ছোটবৌ ত আরও ক'সিঁড়ি নীচে। কাজেই এদিনকার ঝগড়াটা একটু সহজেই মিটিয়া গেল। বড় কর্ত্তা বড় বৌএর অশ্রুম্লান-মুখখানি দেখিয়া বারে বারে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও মূল কারণের সন্ধানে যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হইতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে মেজ-বৌ আপনার ঘরে বসিয়া ছোট বৌএর প্রতি দারুণ নির্য্যাতনের এবং তাঁহার অর্থকষ্টের নানা শ্রেণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সহরের ঠিকানায় দেবরের নামে পত্র পাঠাইতেছিলেন। সেই পত্রের উপসংহারে চতুরা মেজবৌ দেবরকে অনেক কাকুতি করিয়া লিখিয়া জানাইলেন যে "ওগো বিদেশের বাবু আমার প্রাণে অনেক সহে,—আমার বুকে অনেক বহে, আমার জন্য ভেবোনা

আমিও ভাবিনা, কিন্তু এই সোণার কলিটী, আহা ছোট বোন্‌টী আমার, দিন দিন দারুণ নির্য্যাতনে শুকাইয়া ঝড়িয়া পড়িবার মতন হইয়াছে। ছেলেমেয়ে গুলি উপযুক্ত রকমের খাওয়া পরার অভাবে শ্রীহীন রোগা হইয়া যাইতেছে। শুধু একবার আসিয়া তাহাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, আমার আদরের বোন্‌টীকে আমি আর এমন করিয়া নীরবে মরিতে চাহিয়া দেখিতে পারিব না। মাথা খাও শুধু একবার আসিয়া না হয় চোখের দেখাই দেখিয়া যাও"। এই পত্রের ফলাফল আমরা কিছু পরে জানিতে পারিব। আপাততঃ রুগ্না পিতামহীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আমাদের কৃষ্ণকালী কি করিতেছে তাহাই দেখিয়া আসা যাক্।

কৃষ্ণকালী দেবসেবার কাজ সারিয়া আসিয়াই ঠাকুরমা'র সেবায় নিযুক্ত হইত। জয়কালী ও রামকালী বাবুর ছেলে দু'টী স্কুলে পড়িত, তাহারা স্কুল হইতে আসিয়াই, যথাবিধি জলযোগ করিয়া ফুটবল লইয়া খেলার মাঠে যাইত, আর সন্ধ্যার পরে আসিয়া হাত পা ধুইয়া নিজের নিজের বই হাতে লইয়া বার পাঁচ সাত উচ্চ কণ্ঠে একটু পড়িয়াই ফুটবল খেলার অত্যধিক শ্রমে ক্লান্ত দেহ শয্যায় ঢালিয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। প্রাতঃকালে মেজ বৌর শিক্ষামত তাহারা দুটী ভাই পড়িতে বসিত। এবং স্কুলের সময়ে বই রাখিয়া উঠিয়া স্নান আহার করিয়াই স্কুলে যাইত। পিতামহীর সেবা করা মেজবৌ পছন্দ করিতেন না, বিশেষতঃ সেবা করার লোক যখন রহিয়াছে। কৃষ্ণকালী যখন স্কুলের লেখাপড়া করিবে না,

তখন সেইত এ সকল কাজ করিবার জন্য দায়ী, দেবসেবা, রোগী সেবা, এসকল কাজ যদি আবার সারাদিন স্কুলের লেখাপড়া করিয়া আসিয়া নিশীথকালী আর অসিতকালীকেই করিতে হয়, তবেত হইয়াছে! তাহা হইলে কি আর বাছারা পরীক্ষা দিয়া ভাল পাশ করিতে পারিবে? একেইত ছেলেবেলা পৈতা দিয়া শ্বশুর ঠাকুর ইহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, ইতঃপর যদি আবার এ সকল গাধার খাটুনী খাটিতে হয় তবে কি আর বাছাদের হাড় থাকিবে?—আর ইংরাজী পড়ার সময় যে কতটা মূল্যবান্ তাহা সকলে বুঝিবেই বা কি করিয়া?—তিন বেলা সন্ধ্যা করিয়া করিয়া যে সময়টা মাটি হইয়া যায় মেজবৌএর মতে সেই সময়টা দস্তুরমত পড়িলে নিশীথ আর অসিত যে বৃত্তি পাইত, তাহাতে কি আর ভুল আছে, শ্বশুর ঠাকুর যে সব মাটি করিয়া গিয়াছেন।

মেজবৌ নিজেও বড় শাশুড়ীর দিকে ঝুঁকিতেন না, তবে তিনি খুব চালাক ছিলেন, সেই জন্য পাড়ার কেহ আসিলে সর্ব্বাগ্রে শাশুড়ীর মহালে হাজির থাকিতেন। কিন্তু হাজির থাকিয়াও তখন শাশুড়ীর সেবা করাটা লজ্জাজনক মনে করিতেন। কি জানি বড়বৌ যদি ভাবেন যে মেজবৌ বড় দুর্ব্বলচিত্ত। বরং এ সকল কাজ বড়দিদিই যে ভাল পারেন তাহাই নানা রকমের কথার মধ্যদিয়া প্রকাশ করিতেন, মেজবৌ এই ভাবটা সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন যে শাশুড়ীত আর পর নহেন, যে তাঁহার সেবা করিয়া লোককে দেখাইতে হইবে! আমরা তাঁর সকলেই সমান,



যে যা ভাল জানি, যা ভাল পারি, তাই করি ! বড়বৌ একটু হাসিতেন, পাড়ার মেয়েরা মেজবৌর সরলতা দেখিয়া গলিয়া যাইতেন। মেজবৌ নিজের মেয়েটীকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগি-লেন। অবসর মত সেলাইর কাজ হাতে দিয়া বসাইয়া রাখি-তেন। বড়বৌর মেয়েটীর বয়স ১০।১১ হইবে সে অনেক কাজ করিতে পারিত, আলস্যও বড় ছিলনা, সকল কাজ সারিয়া ঠাকুর মার সেবা করিত।

একদিন ঠাকুরমার শয্যা পার্শ্বে বিন্ধ্যবাসিনীও ছিল, ঠাকুরমা পৌত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কেষ্টদা, তোর সকল কথা মনে আছে" ? আছে বৈকি ঠাকু'মা—!—'তুই কি টোলের পড়া ভালবাস্‌বি !" "কেন বাস্‌বনা ঠাকু'মা ?" "তুই নবদ্বীপ যেয়ে পড়ে বড় পণ্ডিত হয়ে আস্‌বি ?" "তোমার আশীর্ব্বাদ।" "তোর পিতামহের নাম রাখ্‌তে পার্‌বি !" "তোমার আশীর্ব্বাদ ঠাকু'মা !" "তোর পিতামহের টোল তুই আবার গড়ে তুলতে পার্‌বি !" "তোমার আশীর্ব্বাদ ঠাকু'মা !" "এই গৃহ দেবতার সেবা তুই চিরকালই কর্‌বি ?" "কেন করবনা ঠাকু'মা !" "একাজে যে টাকা হবেনা কেষ্টদা !" "নাইবা হল ? ঠাকুরের দয়া হবেত ? তোমাদের সুখ হবেত ?"—বৃদ্ধার চোখে জল ছুটিল ! বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "কেষ্টদা অন্নু নিশু তারা কি ঘরে নেই ?"—"না ঠাকু'মা তারা স্কুলে



গেছে ?” “হ্যা দাদা তারা বাপের মত লায়েক হয়ে টাকা কামাই কর্‌বে !”

একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ-শ্বাসে বৃদ্ধার শ্বাসরোধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল কোনও মতে সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধা চারিদিকে চাহিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন “ওকে আরও কিছুদিন ঘরে রাখ্‌তে হবে এটা আমার বড় দুঃখ ! কিন্তু উপায় নেই !” “আরত কমাস বাদেই সপিণ্ডীকরণ হবে ঠাকু’মা ?” বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন, “আমিও যে চল্‌ছি কেষ্টদা !” কৃষ্ণকালীর মুখ মলিন হইয়া গেল ! বিন্ধ্যবাসিনীর চোখদিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল ?

(৫)

“কে-●-গোপাল ?”—

“আজ্ঞে হ্যাঁ মা, বড় দেরী হয়ে গেল জ্বরে পড়েছিলাম ! অপরাধ মাপ হয় জননী !

“গোপাল ! একটু এগিয়ে এস বাবা, ঘরে কেউ আছে ?” বৃদ্ধার ইঙ্গিত বুঝিয়া ঘরের সকলেই বাহির হইয়া গেল, রামগোপাল বাবু কহিলেন, “মা আমার এখন আসা কি আপনার অভিপ্রেত ছিল ?”—বৃদ্ধা কহিলেন, “তাকি তুমি জাননা গোগাল ?”—

বৃদ্ধা একটু হাসিয়া দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে ত্যাগ করিলেন। "এখনো জ্বর আছে কি মা? মাথা ধরাটা?"—বৃদ্ধা কহিলেন"'সবই আছে গোপাল! খালি বেঁচে থাক্‌বার প্রবল আকাঙ্ক্ষাটা নেই, যেটা ধ্বংশের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটা অশান্তি জাগিয়ে রাখে। গোপাল, আমি যাচ্ছি!" বৃদ্ধা চক্ষু মুদিলেন। রাম গোপাল বাবু অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন বৃদ্ধাও নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুত্যাগ করিলেন, কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা একটু হাসিয়া রাম গোপাল বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "গোপাল, আমায় কিছু বল্‌বে কি?—"সেত আপনার অজ্ঞাত নয় মা! আমার জিজ্ঞাস্য—" বৃদ্ধা বাধা দিয়া বলিলেন "গোপাল! কর্ত্তার শ্রাদ্ধে আমার চাকুরে ছেলেদের টাকা আমি ইচ্ছা করেই খরচ করিনি, এর পরিণামে যে আমার সংসার ভাঙ্গবে সে বুদ্ধিও আমার তখনই হয়েছিল। বল্‌তে কি গোপাল, আমার এমন সংসার ভেঙ্গে যাওয়াই বোধ হয় কর্ত্তার অভিপ্রেত। সে কথা পরে হবে বাবা,—বল দেখি গোপাল, সরকারি কাজের অছিলায় যারা পিতার শ্রাদ্ধ বাধা কর্‌তে কুণ্ঠিত নয়, অথচ নক্‌রি করে শ্রাদ্ধের টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে বলে মনে কর্ত্তে পারে তেমন ছেলের টাকায় তোমাদের কর্ত্তার শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হবে বলে কখনো মনে কর্‌তে পার কি? তারা রোজগার কর্‌ছে স্ত্রী পুত্র সুখে থাক্‌বে, তাদের স্ত্রীপুত্রের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে আমি কাউকে দেবনা গোপাল, নেত্যকেও নয়, কেষ্টকেও নয়"; বৃদ্ধা

একসঙ্গে অনেক গুলি কথা বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন, জোরে শ্বাস বহিতে লাগিল, রামগোপাল বাবু একখানি পাখা লইয়া একটু দূরে থাকিয়া সংকোচের সহিত হাওয়া করিতে লাগিলেন।

"গোপাল, আমার শ্বশুরের বংশের ধারা উল্টে গেছে এই একপুরুষে! তুমি কায়েতের ছেলে যে জাত হারাওনি, আমার গর্ভে কর্ত্তার ঔরসে জন্মে, জয় আর রাম—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই জাত হারিয়ে ফেলেছে। গোপাল, শুন্‌লে চোখ ফেটে রক্ত বেরুবে সেই হাওয়া আমার শ্বশুরের ভিটার কুকুর বেড়ালটাকেও নাচিয়ে তুলছে! এই বদ্‌হাওয়া থেকে নেত্যকে আর আমার কেষ্টদাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হলে মিলিত সংসার ভেঙ্গে চুরেই তা কর্‌তে হবে। এঅর্থের প্রলোভনে বিলাস বিভ্রমের মোহ প্রমাদে এঁদের বাঁচিয়ে রাখ্‌বার আর কোন পথ খুঁজে পেলেম না গোপাল, তাই জেনে শুনে এইকাজ করেছি,—জানি ওরা চিরকাল দরিদ্রই থেকে যাবে, তবু আমার শ্বশুরের বংশের ক্ষীণ ধারাটী শুধু ওদেরই শুষ্ক ধমনীর ভিতর দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে বইবে! গোপাল, আমি কি অন্যায় করেছি? বৃদ্ধা আশান্বিত নেত্রে রাম গোপাল বাবুর মুখের দিকে তাকাইলেন। রাম গোপাল বাবু তখন মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বৃদ্ধার মন্তব্যের অভিনন্দন করিতেছিলেন, আর চোখের জলে ভাসিতেছিলেন।

"গোপাল! তুমি ভাব্‌তে পার হয়ত, আমি কিছু বাড়াবাড়ি করেছি, কিন্তু বাবা,—আমি কত বড় বাপের ঝি আর কত বড় স্বামীর স্ত্রী, তা'ত তুমি জান গোপাল!—ধান কুঁড়ের জমিদারের



একমাত্র পুত্র যখন হাকিম হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করবার জন্য, বাড়ীর সকলেরই বিশেষতঃ আমার মার খুবই মত হয়েছিল, একলা বাবার অমত। তখন আমাদের কুলগুরু সার্ব্বভৌম মহাশয় এসে বাবাকে অমতের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, বাবা তখন বলেছিলেন, "ওঁরা ইংরাজি শেখার উপর আবার চাক্‌রী নিয়ে জাত হারিয়েছে! ওখানে সম্বন্ধ করবোনা। আমি তখন বাবার পাশেই বসেছিলাম সার্ব্বভৌম মহাশয় তখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "তর্করত্নদা ওঁরা ত খুব আস্তিকের ঘর তবে জাত হারাল কিসে?"

বাবা তখন একটু হাসিয়া কহিলেন, "গুরুদেব, ম্লেচ্ছের ভাত খেলেই শুধু জাত যায়, তা নয়, অন্য রকমেও জাত যেতে পারে, জাতটা মনুষ্য সমাজের উপরে নানা দিক্ দিয়ে আত্ম প্রকাশ কর্‌ছে, ব্যক্তির জাত, জাতির জাত, সমাজের জাত, পরিবারের জাত, নানা রকম জাতের ধারা আমরা দেখ্‌তে পাই, বিশিষ্টতাই সেই জাতের ধারা। ব্যক্তি যখন তার বিশিষ্টতা হারায় তখনি সে তার জাত হারায়; পরিবার যখন তার বাপ্‌দাদার বিশিষ্টতা হারায় তখনি সে জাত হারায়; এইপুরুষ থেকেই ধানকুঁড়ের এমন পবিত্র ঘরে, তাঁদের বিশিষ্টতা খোয়ান গেল গুরুদেব; এখন থেকে ওঁরা শুধু তলিয়েই যাবে, ধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্মান বাড়্‌বে বটে, কিন্তু সাবেক জাতটাকে খুঁজে পাবেনা তারা!" বৃদ্ধা ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন, রামগোপাল বাবু জোরে বাতাস করিতেছিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন,



"গোপাল ! জয় আর রাম তেমনি জাত হারিয়েছে, তুমি আমার বড় সতর্ক ছেলে, তুমি এখনও হারাওনি !"

বৃদ্ধার দুচোখের দুইধারে দুটী অশ্রু ধারা বহিয়া গেল, রাম-গোপাল বাবু বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "এত যদি জানতেন মা, তবে ওঁদের ইংরেজী শেখাতে দিলেন কেন? আমাকেই বা এর জন্য কলঙ্কী করলেন কেন ‧ মা ?" বাধাদিয়া বৃদ্ধা কহিলেন "গোপাল, তুমি আপশোষ করোনা, কর্ত্তা জান্‌তেন ওরা ইংরাজী না শিখলেও অন্য উপায় তা‧ অসদুপায় হলেও অর্থোপার্জ্জনের দিকেই বেশী ঝোঁক দেবে। এরা ছেলে বেলা থেকেই সুখান্বেষী ছিল, টোলে পড়ে ওদের তৃপ্তি হতোনা, নেহাত ঠেকে টোলে ছিল সন্ধ্যা আহ্নিকে কেমন শ্রদ্ধাশূন্য ভাব ছিল; দেবতার সেবা পূজায় কেমন অনাস্থা অনাস্থা লক্ষ্য হতো, বিশেষতঃ ছোটটার। গোপাল, ওদের জন্য কর্ত্তা অনেক চোখের জল খরচ করেছেন।" রামগোপাল বাবু কহিলেন, "জানিনে মা আপনার বংশে এমন হলো কেন?"

রামগোপাল বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন "গোপাল, ছেলদের মধ্যে কালধর্ম্মে যেটুকু ভোগস্পৃহা ছিল, তা চেষ্টা করলে হয়ত দূর করা যেত, কিন্তু আমার ঘরে শত্রু, গোপাল আমি অনিচ্ছা সত্বে বিষয়ী লোকের মেয়ে ঘরে এনেছিলুম তাদের খেই মেটাতে পারি, আমার বাবারও সাধ্য নেই ?"

রামগোপাল বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সেই প্রশান্তমূর্ত্তি শিরোমণি মহাশয়ের কথা তাঁহার মনে পড়িল, আর মনে পড়িল তাঁহার টোলের কথা, নানাদেশের বিদ্যার্থী আসিয়া সেই গ্রামটীকে কত বড় করিয়া তুলিয়াছিল। যে দিন শিরোমণি মহাশয় অনিচ্ছা সত্ত্বে জয় আর রামবাবুকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য সহরে রাম গোপাল বাবুরই সঙ্গে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই সকল কথা এক সঙ্গে স্মৃতি পথে আরূঢ় হইয়া রামগোপাল বাবুকে কেমন আড়ষ্ট করিয়া তুলিল, রামগোপালবাবু ভাবিতেছিলেন "হায় হায় আমিই ইঁহাদের পরিবারের জাত মারিয়াছি!"—

"গোপাল!"—

"আজ্ঞে মা!"—

"দেশের হাওয়া কি বড় বদ্‌লে গেছে বাবা?"—

"আজ্ঞে বেরুবার যদি সময় থাক্‌ত মা, তবে দেখ্‌তেন আসমান জমিন তাফাৎ হয়ে গেছে!"—শুনিয়া বৃদ্ধা একটা জোরে দীর্ঘ-শ্বাস টানিয়া লইয়া কহিলেন, "সর্ব্বনাশ করেছি গোপাল শুধু এদেরই ভিখিরী করে গেলুম!" রামগোপাল বাবু কহিলেন "কর্ত্তার উইল সম্বন্ধে কি করা যাবে মা?" বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "ওতে কিছু হবেনা গোপাল! ওরা শুধু দারিদ্র্যের বিনিময়েই কর্ত্তার টোল আর দেবতার সেবা কাঁধে করে নেবে; উইলের জেয়াদা অংশ ওরা স্পর্শই কর্‌বেনা!"—



রামগোপালবাবু কহিলেন,—"আপনি কি তাহলে উইলের মর্ম্ম তাঁদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন মা ?"—

বৃদ্ধা কহিলেন ;—"পেটের ছেলের ধাত চিন্‌তেও কি আমার ভুল হবে বাবা ?"—রামগোপাল বাবু লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট্ করিলেন।

"মা কেমন আছেন গোপালদা ?"—এই কথা শুনিয়া রামগোপাল বাবু সহসা চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন রামকালী বাবু ছোট মেয়েটীর হাত ধরিয়া জননীর শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জননীর পদধূলি লইতেছেন।—"কখন এলে ভাই ?"—"এইত এলাম গোপালদা ?"—"মার জ্বরটা বোধ হয় কম !" "কম আর কই দাদা !—"হ্যাঁ একটু কম কম বলেইত বোধ হচ্ছে !—কেমন মা, তোমার জ্বরটা আজ একটু কম নয়" ?—বৃদ্ধা কহিলেন "হবে" !

রামকালী বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন,—"যাক্—বাঁচা গেল বাবা, এই সেদিন বাবা স্বর্গে চলে গেলেন, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যদি মাও চলে যান, তবে ত আর দাঁড়াবার জায়গাই থাক্‌বেনা গোপালদা, নাঃ—কই তেমন আশঙ্কার কারণ কিছুই নেই, সংবাদ পেয়েত একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম" !—"তোমারত ক'দিন দেরী হবে বল্‌ছিলে,—আর এখন আমার পাছে পাছেই যে!" প্রশ্ন শুনিয়া রামকালী বাবু 'থতমত' খাইয়া কহিলেন—"হ্যাঁ গোপাল দা, তাইত কথা ছিল, হঠাৎ মেজদার সর্দ্দির মত করে—কি জানেন, কেমন একটা অসুখের মত ভাব হয়ে গেল, বাসায় অষুধ পথ্য দেবার



মহা মুস্কিল দেখে তাড়াতাড়ি আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, যে 'মাকেও দেখে আয়গে, ওদেরও কদিনের জন্য নিয়ে আয় গে, নইলে এবার বিদেশে প্রাণেই বুঝি মারা যাবো" ।—

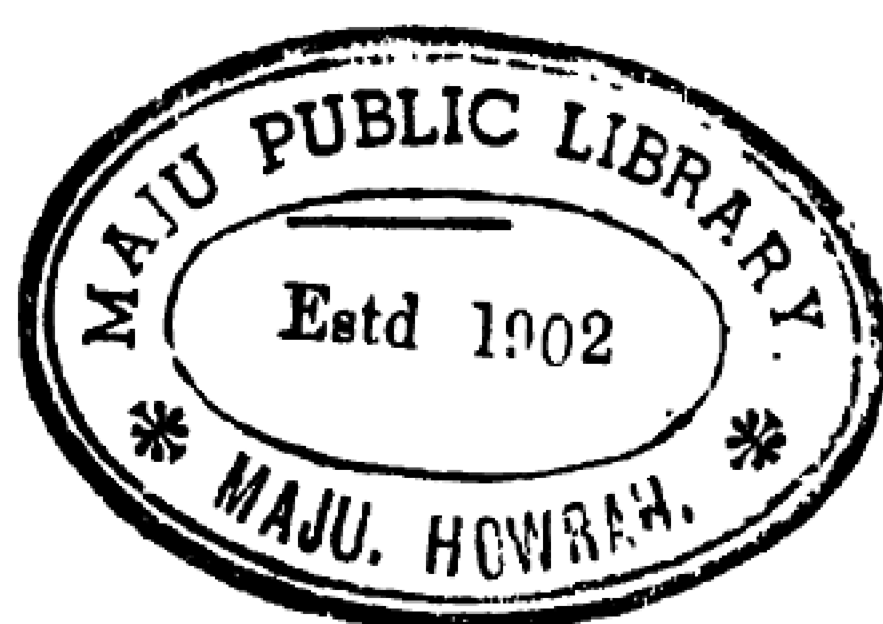
রামগোপাল বাবু একটু বিরক্ত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"বাসায় এখন মেয়েছেলে নিয়ে রাখ্‌বে কোথায়?"—রামকালী বাবু কহিলেন,—"এই এরি মধ্যে রাতদিন খুঁজে একটা বাসা ঠিক্ করেছি, এখন মা আর বড়দা অনুমতি কর্‌লেই এঁদের নিয়ে যেতে পারি। এত আর বেশী দূরের রাস্তা নয়, যখন ইচ্ছা চলে আস্‌লেই হবে, আমাদের বরং চাক্‌রী, ওদেরত কোন চাক্‌রী নেই। কি বলেন গোপালদা ?"

রামগোপাল বাবু কহিলেন "সেত বটেই,—তবে কি না মা'র অসুখটা বড় ভাল নয় ?" রামকালী বাবু কহিলেন,—"মা'র অসুখের জন্য আপ্‌নি কিছু ভাববেন না গোপালদা, আমি কি আর আপন মার ভাল মন্দটা বুঝিনে ?"—কাণের কাছে আস্তে আস্তে কহিলেন— "মার পাকা হাড়,—এখনো ঢের দেরী" ।—শুনিয়া রামগোপাল বাবু মুখ বিকৃত করিলেন,—রামকালী বাবু সংকুচিত হইয়া গেলেন !—

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নৃত্যকালী কহিলেন,—"জয়ের অসুখ, বৌমাদের নিয়ে যাওয়াইত ভাল গোপালদা। আবার কদিন বাদে নিয়ে এলেই চল্‌বে। আমিও কি দেখে আস্‌ব রাম ?"—রামবাবু কহিলেন—"আপনি মাকে রেখে এখন কোথাও যেতে পারেন না বড়দা ! কি বলেন গোপাল দা ?"—রাম গোপালবাবু মাথা নাড়িলেন।—নৃত্যকালী কহিলেন—"মা' রাম বৌমাদের নিতে এসেছে জয়ের নাকি

অসুখ—তুমি বলে দাও!”—বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন—“আসুক গে—”

রামবাবু কহিলেন—“তুমি যে কাহিল মা?” বৃদ্ধা পুনরপি একটু হাসিয়া কহিলেন—“আমার এ পাকা হাড় বাবা এখনো ঢের দেরী আছে।” রামগোপাল বাবুর চোখ দুটী দপ্ দপ্ করিতেছিল, রামকালী বাবু কহিলেন,—“মা তোমার চিকিৎসার জন্য মেজদা আলাদা করে মাস মাস টাকা পাঠাবেন, বলে দিলেন’—রামকালীবাবু উৎসুক নেত্রে জননীর মুখের দিকে তাকাইলেন—জননীর ওষ্ঠ প্রান্তে হাসির দাগটুকু লাগিয়াই রহিয়াছে, তিনি কহিলেন—“আমার দরকার করে না বাপু! তোমাদের কর্ত্তা আমার হাতে যা তুলে দিয়েছেন—তাতেই আমার বাকী দিন কটাও কেটে যাবে। তোমরা সুখী হও। যাবার আগে অম্বু আর নিশুকে একবার দেখিয়ে নিও!”—বৃদ্ধা পাশ ফিরিয়া শুইলেন দেখিয়া একে একে সকলেই গৃহত্যাগ করিলেন—রামগোপাল বাবু কহিলেন—“তবে এখন আসি মা”—বৃদ্ধা ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন।



(৬)

মেজবৌ আর ছোটবৌ একমাস ধরিয়া বাসায় আসিয়াছেন, তাঁহারা বাসায় আসিয়া অবধি একমাস বাসাখানা সাজাইয়া তুলিবার জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। দুজনের শোবার ঘর দু'খানি খুবই সুন্দর করিয়া সাজাইলেন, রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর ও দিনে বসিবার ঘরগুলিও বিশেষ যত্ন সহকারে সাজান গুছান হইল। এবং এই সাজ সরঞ্জামের মধ্যে শিক্ষিতরুচির এবং আঢ্যতার গন্ধটুকুও বেশ মাখান ছিল। মেজবৌ ধনবানের কন্যা, তিনি পিত্রালয়ের আদর্শ অনুসারে ঘরগুলি বেশ করিয়া সাজাইলেন। রামকালীবাবুর একমাসের রোজগার গৃহ সজ্জায় খরচ হইয়া গেল।

জয়কালী বাবু এইমাস মাত্র কএকটী টাকা বাড়ীতে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মেজবৌ যেরূপ নিপুণতার সহিত পারিবারিক অবস্থার কথা প্রতিদিন বর্ণনা করিতেন এবং এখানকার প্রেরিত টাকা গুলি শাশুড়ী ঠাকুরাণী হইতে ইস্তক কৃষ্ণকালীর পর্য্যন্ত যেরূপ ঘৃণা এবং অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিবার সংবাদ তিনি প্রদান করিতেন তাহাতে জয়কালী বাবু এবং রামকালী বাবুর বাড়ীতে টাকা পাঠাইবার আগ্রহও দিন দিন কমিয়াই আসিতেছিল। তথাপি লোক লজ্জার খাতিরে টাকা পাঠাইতে বিরত হন নাই। মেজবৌ ক্রমে-ক্রমে চাবিটী সংগ্রহ করিবার মতলবে ছিলেন, যদিও চাবিটী এখনও হাতে আসে নাই ; তথাপি তিনি আশা করিতেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ইস্তক ছোটবাবুর চাবিটীও তাঁহার আঁচল খুটে বদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মেজবৌ বিষ ঢালিতেন বটে, কিন্তু তাহা বিন্দু বিন্দু করিয়া। তিনি শিকার করিতেন বটে, কিন্তু মাছটাকে একটানে তুলিতেন না, বেশ খেলাইয়া খেলাইয়া তুলিতেন,—মেজবউ পাকা শিকারী। তিনি প্রতিদিন অবসর মত দেবরকে লক্ষ করিয়া দেশের পারিবারিক অবস্থা যাহা বর্ণনা করিতেন,—তাহাতে ছোটবৌএর প্রতি কঠোর নির্য্যাতনের কথাই বেশীর ভাগ থাকিত। ছোট বৌএর দুঃখ কষ্ট দেখিয়াই যে তিনি বিদেশবাসিনী হইয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ছোটবৌ তেমন চালাকও নহেন, পাকা সংসারীও নহেন, কাজেই তাঁহাকে বড়বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে এক হইয়া দিন রাত যন্ত্রণা দিয়াছেন, ছেলে মেয়েদের নিদারুণ কষ্ট দিয়াছেন। ছোটবৌএর পক্ষে দু'কথা বলিতে গিয়া অনেক সময়ে ভাসুর ঠাকুরের তিরস্কারও যে মেজবৌকে সহ্য করিতে হইয়াছে—তাহার সাক্ষী এখন একমাত্র ছোটবৌ বিদ্যমান আছেন।

মেজবৌ এ সকল কথা অম্লান বদনে বলিয়া যাইতেন, ছোটবৌ অনেক সময় অবাক হইয়া ভাবিতেন—মেজদি এত সব কথা কোথা হইতে তৈরি করিয়া আনিতেছেন। যদি ধরা পড়েন?—মেজদি নাকি ধরা পড়িয়া কোন দিন অপদস্থ হন, এই আশঙ্কায় ছোটবৌর অনেকদিন ঘুম আসিত না। তাঁহার আরও একটা আশঙ্কা ছিল—যদি স্বামী কখনো এসকল কথা জিজ্ঞাসা করেন? তবে তিনি কি বলিয়া স্বামীকে প্রবোধ দিবেন? স্বামীর কাছে মিথ্যা কথা বলিবেন? মেজবৌ যখন গড়াইয়া গড়াইয়া ছোট বৌএর

লাঞ্ছনার কাহিনী বলিয়া যাইতেন তখন ছোট বৌএর বুকটা 'দুর দুর' করিয়া কাঁপিতে থাকিত। ছোটবৌ দুটী হাতে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া ভগবানের নাম করিতেন। এই এক মাস কাটিয়া গেল, ছোটবাবু একদিনের জন্যও ছোটবৌকে সত্যতার প্রশ্ন কখনো করেন নাই, মেজবৌ বলিয়া যাইতেন তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাই শুনিতেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা গ্রহণ করিতেন। মেজবৌএর এইরূপ বর্ণনায় দু'টী উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছিল, বড়বৌ বড়ঠাকুর ও শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দেবর এবং স্বামী যেমন দিন দিন বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, ছোটবৌ এবং দেবর ইহাঁরা মেজবৌ'র উপরে তেমনি দিন দিনই অত্যন্ত বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা পোষণও করিতে ছিলেন।

মেজবৌ আজ কাল বাসার সর্ব্বময় কর্ত্রী। ছোটবৌ তাঁহার হাতের ক্রীড়াপুতুল। তবু ছোটবৌ দেশ হইতে সহরে স্বামীর কাছে আসিয়া নিজকে বিশেষ সুখী মনে করিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। সুখও স্বাধীনতার সুবিধাও যে বেশ রহিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই। তবু ছোটবৌএর একটা বিষয় বড়ই অসুবিধা ঠেকিতেছিল। ছেলেমেয়েদের হেঙ্গামাটা বড়বৌ যেমন করিয়া পোহাইতেন, মেজবৌ কিন্তু তাহার একবিন্দুও করেন না। অসু নিশু স্কুল হইতে আসিয়াই বড়বৌএর নিকট জলখাবার চাহিত, বড়বৌ কত কিছু খাবার জিনিষ আগে হইতেই তৈরি করিয়া রাখিতেন, তাহারা জলযোগ করিয়াই ফুটবল লইয়া খেলার মাঠে চলিয়া যাইত। রাত্রেও সকল বন্দোবস্ত বড়বৌই করিতেন।

এখনও তাঁসু নিশু স্কুল হইতে আসিয়াই মেজবৌএর কাছে হাজির হয় বটে, কিন্তু খাবারটা খানসামার মারফতে দোকান হইতে আমদানী হইয়া আসে। ছোটবৌ এটা পছন্দ করিতেন না সত্য, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাঁহার ছিলনা। মুস্কিল হইত ছোট বৌএর শিশু দু'টীকে লইয়া, এ দু'টীর স্নান করান, দুধ খাওয়ান, শোয়ান ইত্যাদি সকল কাজ অবলীলাক্রমে বড়বৌ করিতেন, সম্প্রতি মেজবৌ তাহা করিবার মত কোন অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিলেন না, দেখিয়া শুনিয়া ছোটবৌকে নিজ হাতেই এগুলি করিতে হইতেছে। কিন্তু বড় কষ্টে! একেত অভ্যাস কম, দ্বিতীয়তঃ অন্যে করিয়া করিয়া মেজাজও বিগড়াইয়া দিয়াছে। ছোট বৌ এই নিয়া রোজই দু'একবার চোখের জল ফেলাইয়া থাকেন;— বড়বৌকেও তখন মনে পড়ে, কিন্তু উপায় নাই।

ঠিক্ এইশ্রেণীর অসুবিধাটা মেজবৌকে নিজের দিক্ দিয়াও ভোগ করিতে হইতেছিল। মেজবৌ দমিবার মেয়ে নহেন, তিনি এক সঙ্গে দু'জনের জন্য দু'টী ঝি রাখিয়া লইলেন। মেজবাবু খরচ পত্রের এসকল বাড়াবাড়ি দেখিয়া একটু বিরক্ত হইতেছিলেন, কিন্তু ছোটবাবু তখন নূতন সংসার পাতিয়া সবেমাত্র একটু আয়েস করিয়া লইতেছিলেন, এখন মেজবাবুর ব্যয় সংক্ষেপের কথা ভাল লাগিবে কেন? বিশেষতঃ বুদ্ধিমতী হিতৈষিণী মেজবৌএর কথার উপর দিয়া।—

কিন্তু মেজবাবু বাসার এসকল ঠাট্‌পাট্ পছন্দ করিতেছিলেন না। তিনি মেজবৌএর সকল কথা বা সকল কার্য্য অন্তরের

সহিত অনুমোদন করিতেন কিনা সন্দেহ, তবে ছোট বাবু বিষয়টা লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিলেন, আর ছোটবৌমাকে যেরূপ নির্য্যাতন করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে বিষয়টা এক কথায় উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে মেজবাবু সাহসী হইলেন না, কি জানি ছোঠবৌমার মনে যদি কষ্ট হয় আর :ছোটভাই যদি এই লইয়া একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া তুলে!—কিন্তু মেজবাবু ইদানীং ইহাও বিশ্বাস করিতেছেন যে বড়দাদা মাকে হাত করিয়া সংসারসতরঞ্চখেলায় এক বাজী মাত করিবার মতলবে আছেন।

মেজবাবু বুদ্ধিমান্ কিন্তু এইখানে তাঁহার ভুল হইয়া গেল। তা হইবারও কথা, মেজবৌ যে ভাবে সর্ব্বদা সকল কথা বিবৃত করিতেন তাহাতে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও বিশ্বাস না করিয়া উপায় থাকিত না। মেজবৌ আস্তে আস্তে সংযম ও ধীরতার সহিত বিষ ঢালিতেন। ছোটবাবু একটু গেঁয়ার ও সরল গোছের ছিলেন, তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া মত্ত হইলেন। মেজবাবু সতর্ক হইলেও দুই চারি ঢোক যাহা গিলিতেন তাহাতেও ক্রিয়া না হইয়া যাইত না। মেজবৌএর হাত যশ আছে।

একদিন আফিসের ফেরত মেজবাবু অন্দরে ঢুকিয়া দেখিলেন ছোটবাবু একটু আগেই বাসায় আসিয়াছেন, এবং কাপড় চোপর ছাড়িয়া মেজবৌ এবং ছোটবৌএর সঙ্গে মেজবাবুর ঘরেই বসিয়া খোস গল্প করিতেছেন, মেজবাবু মুখ ভার করিয়া বলিলেন "রাম খবর বড় সুবিধার নয়, মা বোধ হয় চল্লেন"—।



মেজবাবু কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, রামবাবু মেজবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"কিছু খবর পেলেন" ?—"এই পত্র" বলিয়া মেজবাবু চিঠি খানা রামবাবুর দিকে ফেলিয়া দিলেন,—ছোটবৌ একটু আগেই আড়ালে গিয়াছিলেন,—মেজবৌ একটু ঘুম্‌টা টানিয়া দেবরের হাতের পত্রের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িলেন। রামবাবুর পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল,—মেজবৌ মুখ ভার করিয়া দুশ্চিন্তার অভিনয় করিতেছিলেন—ছোটবাবু পত্রের মধ্য হইতে অতি নিপুণ ঐতিহাসিকের মত সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা পাইতেছিলেন বলিয়া মনে হইতেছিল, মেজবাবু বিছানায় বসিয়া বলিলেন,—"এবারত দেরী কর! চল্‌তে পারেনা রাম,—আজই যেতে হয়" !—"আজই" ? "আজই"। "এত ত্রস্ত" ?—"চিঠি দেখ্‌ছনা ? অবস্থা যে ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে" ! মেজবাবুর চোখ ছল ছল করিতেছিল জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণে তাহা ছাড়িলেন, যেন হৃদয়ের অনেকখানি ব্যথা, অনেকটা ভার: তাঁহাকে বুকে ঠেলিয়া সরাইতে হইতেছিল !—

রামবাবু মেজবৌএর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ—চিঠিটা, যদি যথার্থই হয় যদি"—বাধাদিয়া মেজবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"যথার্থই মানে ?—এটাকি চিঠি নয় ? ভ্রম ?" মেজবাবুর চোখ ফাটিয়া আগুন বাহির হইতেছিল। ছোটবাবুর সেদিকে লক্ষ থাকিলে সে সময় অন্য কথা মনে আনিতে পারিতেন



না, তিনি মেজবৌএর মুখেরদিকে এক নজর চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন "ভ্রম নয় মেজদা—! তবে কথাটা কি এইত সেদিন মাকে দেখে এসেছি, এরি মধ্যে এতটা খারাপ অবস্থা হতে পারে বলে বিশ্বাস হয়না, তবে পুত্রের হৃদয় শঙ্কাপূর্ণ থাকবারই কথা তাই হয়ত বড়দা কিছু বাড়িয়ে লিখেছেন, কি বল মেজবৌদি ?"

মেজবাবু একটু হাসিলেন সে হাসি অতি ক্ষীণ, দেখিলে মনে হয় হৃদয়ভরা বিষাদের মেঘ স্তর চিরিয়া একটা রক্তের ক্ষীণবিদ্যুৎঝলক তাম্বূল-রক্ত-অধর-প্রান্তে একটু খানি দাগ রাখিয়া গিয়াছে। মেজবাবু নীরবে কি যেন ভাবিতে ছিলেন, বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে ছোটবাবুর "পুত্রের হৃদয় শঙ্কাপূর্ণ থাকবারই কথা" এই কথাটা বারে বারেই বিঁধিতে ছিল, সহসা মেজবৌএর যোগদানমূলক ধ্বনি শুনিয়া মেজবাবু অবহিত হইলেন।

মেজবৌ নথ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন "ঠাকুরপো যা বল্লে তা সত্যিও হতে পারে আবার অনেকটা মিথ্যে ও হতে পারে, আমি বলি কি এসব তর্কের জায়গা এটা নয়। মা, জননী তিনি কাতর এই সংবাদই যথেষ্ট। ভাবের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই নিয়ে তর্ক না করে আজই বাসা টাসা একরকম গুছিয়ে সবারই চলে যাওয়া উচিত। মা যদি সকাল সকাল চলে যান তবে হয়ত মাস খানেক মধ্যেই ফিরে আসা চলবে। আর যদি আমাদের ভাগ্যে আরও দুমাস ঠিক আজ না কাল করে করে থেকে যান তবে হয়ত তাঁকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে কারুরই চলে আসা ঘটবেনা;

সেটা লোকেও ভাল দেখবেনা মনেও প্রবোধ হবেনা। সুতরাং দুমাসের মত বাড়ীর খরচ পত্তর সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয়। তাতে কুলোতে ও পারে নাও পারে, কিন্তু তা ভাবলেওত চল্‌বেনা, মা যখন কাহিল তখন যেতেই হয়!"

মেজবৌ কি ভাবিয়া চুপ করিলেন, তিনি এই ভাবে আরও অনেকক্ষণ বলিয়া যাইতে পারিতেন যেহেতু তিনি শিক্ষিতা ও বটেন, বুদ্ধিমতীও বটেন। মেজবৌ আবার কহিলেন "তোমরা দেখ, আমি কি বুঝি"? উৎসাহিত চিত্তে ছোটবাবু কহিলেন "তুমি বোঝ না? ঠিকইত বলেছ অবশ্য কার হৃদয়ে কি আছে তা ঠিক করে বলা কঠিন, তবে অনুমান যা হয় তাতে মনে হয় এই দুমাসের বহর মেটাতে অনেক খানি তেল নুন খরচ করতে হবে। যেতে আসতে খরচ, রোগীর পথ্য, ঠাকুর সেবা, সংসারের খরচ, এর পর মা কাহিল এই সংবাদ শুনে বন্ধুবান্ধবের আমদানিও নেহাৎ কম হবেনা। তাঁদের ভদ্রতা রক্ষা শেষটায় শ্রাদ্ধশান্তি এই সব ব্যাপার সমাধা করতে কম করে হলেও অড়াই হাজার টাকা বেড়িয়ে যাবে,—এদিকে চাকুরীও বন্দ রইল এত টাকা এখন কোত্থেকে আসবে তা আমি জানিনে তবে আপনার অমতে আমার কথা বলবার ইচ্ছানেই। বড়দা যদি এটা বাড়িয়েই লিখে থাকেন, তবে বড় বৌদির বুদ্ধির তারিপ করতে হবে!—"

মেজবাবু তামাক টানিতেছিলেন, কোন কথায় যোগদান করার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। মেজবৌ নথ নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া



সুরে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিলেন "ওর ভেতর মেয়ে মানুষকে এনে জড়াচ্ছ কেন ঠাকুরপো ? বুদ্ধি কি পুরুষের নেই যে ওঁরা খালি মেয়েদের কথা মতই চলবে ? দিদির যদি ওর ভেতর কিছু স্বার্থ থাকে,—অবশ্য অগোচরে গুরুজনের উপর মিথ্যা কথা বলিনা, কার মনে কি আছে জানিও না, কথায় বলে "পর চিত্ত ঘোর অন্ধকার"—থাক—তবে সেই স্বার্থ বড় জোর তেল নুনটুকু বা অন্ততঃ সেমিজ শাড়ী-টুকুর সীমা ছাড়িয়ে যায় নি,—একথা সত্য। তবে তোমাদের কথা, গুরুজন, শত শত দণ্ডবৎ পাপ মুখে কি বলতে কি বলি, কাজ নেই !"—মেজবৌ একটু হাসিয়া এবার মেজবাবুকেও কৃতার্থ করিলেন !—

"ভুল বুঝ্‌লে মেজবৌদি !—বড় বৌদিকে চিনতে তোমাদের আরও ঢের দিন লাগ্‌বে !—এক কথায় তোমায় বলে দিচ্ছি বাবার উইল টুইল যত কিছু কাণ্ড, শুধু এই একটী মানুষের মগজ থেকে বের হয়েছে ! যাক এ সকল কথা আপাততঃ মেজদার ভাল লাগবে না—তাঁরও একদিন চোখ ফুটবে !" মেজবৌ কহিলেন "থাকলেত ফুটবে ?"—মেজবৌ কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই—হাসির প্রলেপে ক্ষতটার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ছোটবৌকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "দেখে আয়ত ছোট, তোর সুকুর গাটা হাত দিয়ে গরম হলো কি না, মেয়েটা আজকে খালি হাঁচছিল, সর্দ্দির মত করেছে" !

ছোটবৌ নিদ্রিত কন্যার গায়ে হাত বুলাইয়া জ্বরের কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু মেজদি যখন হাঁচিবার কথা বলিয়াছেন,

তখন একটু জ্বর না হইয়া কি গিয়াছে। সন্দেহ ও শঙ্কায় মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনি নিজে কিছু ঠাহর করিতে না পারিয়া মেজবৌকে ইঙ্গিত করিলেন, মেজবৌ বলিয়া উঠিলেন, "আঃ নেকি, তোর কি উপায় হবে? মেয়েটার জ্বর হলো কি না ওটা গিয়ে আমাকেই বলে দিতে হবে আবার? অসুখ হ'লেত আর রক্ষা রাখবিনে!"

মেজবৌ সুকুমারীর গায়ে হাত দিয়া জ্বর দেখিবার চেষ্টা করিলেন সহসা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মেয়েটী ঠ্যাঁ ঠ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মেজবৌ মেয়েটীকে কোলে তুলিলেন, মেয়ের কান্না আর থামে না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, মেজবৌ তাহাকে লইয়া তাঁহার নিজের ঘরে গেলেন এবং ছোট বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "না: এই মেয়েটাকে রক্ষা করা কঠিন হবে দেখছি। বুক ভরা কফ দুদিন ভাল যায়না, জ্বরত লেগেই আছে, দেখছনা চোখ মুখের ভঙ্গী, হাসই বেরোয় না কি ছাই, আর ভাল লাগেনা। ওকে নিয়ে বা যাবেই কি করে; আর না গেলেই বা চলবে কি করে? আমিত একবার মাকে না দেখলে কিছুতেই টিক্‌তে পারব না। যা হয় কর"—এই বলিয়া মেজবৌ জলখাবার আনিয়া দিলে মেজবাবু অন্যমনস্কভাবে কিছু খাইলেন। পান ও তামাক খাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন "আমার কাপড় চোপড় গুছিয়ে ট্রাঙ্কে নেগে, ৭টার ট্রেনে দেশে যাবো। রাম, তোরা ভারি বৈষয়িক হ'য়ে উঠেছিস!—



"একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর" মেজবাবু ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

ছোটবাবু কহিলেন "মেজদা? আমরা কি যেতে অসম্মত?" মেজবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না না, তা নয় শিশুদের অসুখ বিসুখ নিয়ে হঠাৎ রাত্রে চলে যাওয়া ঠিক হবেনা, আমি যাই তুমি যদু ডাক্তারকে সন্ধ্যার আগেই কল দিয়ো, দেশে যেয়ে অবস্থা দেখে টেলিগ্রাম করবো, তখনকার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলেই চলবে"।

মেজবাবু বাহিরের ঘরে চলিয়া গেলেন, মেজবৌ অবসর পাইয়া ছোট বাবুর সঙ্গে অনেক কথা বার্ত্তা কহিয়া লইলেন। সে সকল কথা অতি অনুচ্চস্বরে হইয়াছিল। ছোটবৌ মেয়ে কোলে লইয়া অনেক রকম চেষ্টা দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, সুকুর অসুখটা খালি মেজদির হাতেই ধরা পড়িয়া গেল কোন্ কলে?—

(৭)

ঠাকুরের আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চের পাশে বৃদ্ধার অন্তিম শয্যা আস্তৃত হইয়াছে। দূরে বসিয়া রামগোপাল বাবু চোখের জলে বুক ভাসাইতে ছিলেন, শয্যা পার্শ্বে নৃত্যকালী, কৃষ্ণকালী, বিন্ধ্যবাসিনী ও বড়বৌ মুমূর্ষুর চরম শুশ্রূষা করিতেছিলেন, আর চোখের জলে ভাসিতেছিলেন। চিরকালের ভৃত্য দয়াল, দাসী 'রতন' আর প্রতিবেশীরা একটু দূরে দূরে কেহ বা বসিয়া কেহ বা দাড়াইয়া আর কেহ বা আবশ্যক মত ফরমাস জুগাইয়া 'হায় আপশোষ' করিতেছিল। এই মাত্র সদানন্দ যেমন চতুর্ম্মুখ লক্ষ্মীবিলাস আর মকরধ্বজে যোগবাহী করিয়া তুলসী পাতার রস আর গঙ্গাজলে সেবন করাইলেন, তাহাতে বৃদ্ধার কফের ভারটা একটু কমিয়া গেল শরীর ও কিছু গরম বোধ হইল। নাড়ী ও একটু প্রকাশপাইল, বৃদ্ধা একবার চারিদিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে রামগোপাল বাবুকে ডাকিলেন, রামগোপাল বাবু কাছে আসিয়া ডাকিলেন,—"মা দাস্কে ডাক্লেন ?" বৃদ্ধা কহিলেন—"বেলা কি আছে" ? "এই ঘণ্টা খানি মা" ! বৃদ্ধা কহিলেন "তারা—এল গোপাল" ?—"এখনো পৌছেনি মা, সন্ধ্যার ট্রেনে এলে ও-রাত ভোর হয়ে যাবে।"—"হগোনা গোপাল, বেশি সময় নেই, কেষ্ট দা !"—"কেন ঠাকুর মা ?"—"চাবিটে নে, আমার ঝাপিটা নিয়ে এসত, দাদা !" বৃদ্ধা মালাদানি হইতে চাবি বাহির করিয়া দিলেন। কৃষ্ণকালী ঠাকুরের ঘর হইতে

একটা ঝাপি বাহির করিয়া আনিল। বৃদ্ধা কহিলেন—"গোপাল —খোলত বাবা কি আছে দেখি।"

রামগোপাল বাবু ঝাপি খুলিয়া গাঁট গেরো বাহির করিয়া মোহরে টাকায় ও সিকি দু আনিতে প্রায় হাজার টাকা বাহির করিয়া কহিলেন "প্রায় হাজার টাকা ওতে আছে মা," বৃদ্ধা মালাদানি হাতড়াইয়া আরও কতকগুলি সোনার সিকি আধুলী ও মোহর বাহির করিয়া দিলেন, রামগোপাল বাবু গুনিয়া বলিলেন "পাঁচশ পঁচিশ টাকা মা।" বৃদ্ধা কহিলেন "ঝাপিতে গহনা আছে না?" "আছে বৈকি মা, খুল্‌বো?" বৃদ্ধা কহিলেন "দরকার নেই, ওই দিয়ে ঠাকুরের ভিটখানা পাকা করে দিও।"

বৃদ্ধা একটু বিশ্রাম করিয়া কহিলেন, "গোপাল, কর্ত্তার দেওয়া টাকা মোট দেড়হাজার—এখনো আমার কাছে আছে। তাঁর উইলের সর্ত্তমতে ঐ টাকা আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই দিতে পারি, শুধু তাই নয়—আরও অনেক পারি—কিন্তু দরকার নেই।"—নৃত্যকালী কহিলেন "এখন থাক্ না মা, তারা আসুক্, তার পর যা হয় করো।"

বৃদ্ধা ধীরে নিস্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"সময় নেই নেত্য, সময় নেই!—যা বলি শোন।—"গোপাল।" "আজ্ঞে মা!" "কবরেজ মশায়—আছেন?" "আছি বৈকি মা!"—কবিরাজ সদানন্দ একটু কাছে আসিয়া বসিলেন। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে কহিলেন—"গোপাল—বেশী কথার সময় নেই বাবা, বিন্ধ্যের বিয়ে দিতে হবে,

তার জন্য পাঁচশ আর আমার কেষ্টদার নদে গিয়ে পড়াশুনো ইত্যাদির জন্য পাঁচশ তোমার কাছে রইল। বাকি পাঁচশ'তে আমার শ্রাদ্ধ হবে। এর একপয়সাও বেশী নয় বলে গেলুম।" সহসা বৃদ্ধার চোখ জলিয়া উঠিল, ক্রমে দুটি ধারা দুই গণ্ড বাহিয়া বালিসে আসিয়া ঠেকিল।

বৃদ্ধার ব্যবস্থায় রামগোপাল বাবু এবং উপস্থিত সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু নৃত্যকালী, কৃষ্ণকালী, ও বড়বৌ কি জানি কেন সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না, তাঁহাদের মনে যেন ভারি একটা সংকোচ বোধ হইতেছিল। ছোটবাবু ও মেজবাবু প্রভৃতির আগোচরে সেইবারে যে উইল সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার জন্যই এই তিনটী প্রাণী কতনা নীরব নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতেছেন, আবার আজ একি অচিন্তনীয় কাণ্ড বৃদ্ধা ঘটাইয়া যাইতেছেন। ইহার ফলে কত যে অনর্থ ঘটিবে তাহা বুদ্ধিমতী বড়বৌত খুবই বুঝিলেন। বড়কর্ত্তা আর বালক কৃষ্ণকালীর ও তাহা বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

বড়বৌএর ইঙ্গিতে কৃষ্ণকালী কহিল, ঠাকু'মা তুমি কাকাদের কারুর জন্য কিছু দিলে না? তাঁদেরও যে তোমার টাকা পাওয়া উচিত—!—রামগোপাল বাবু বিস্ময়মুগ্ধনেত্রে বালকের মুখের দিকে একবার আর বৃদ্ধা কি উত্তর করেন তাহা শুনিবার জন্য বৃদ্ধার মুখের দিকে একবার চাহিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি পারবে কেষ্টদা! গোপাল আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম"। রামগোপাল বাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তথাপি কষ্টে কহিলেন,—"জবাব হলো কৈ মা?"

বৃদ্ধা পুনরপি একটু হাসিয়া কহিলেন, "গোপাল, আমি জানি তাদের কোন অভাব নেই"! কৃষ্ণকালী সহসা চোখের জল আর কণ্ঠের বাষ্পাবরোধ ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—"অমাদেরই বা কিসের অভাব ঠাকু'মা ?—তোমার আশীর্ব্বাদ আর অই দেবতার দয়া থাক্‌লে অভাব কিসের ঠাকু'মা" ? কৃষ্ণকালী বিছানায় লুটাইয়া পিতামহীর পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। রামগোপাল বাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন !

সন্ধ্যা হইল, ঠাকুরের আরতির আয়োজন করিবার জন্য বড়বৌ উঠিয়া গেলেন, কৃষ্ণকালীও হাত মুখ ধুইয়া আসিবার জন্য উঠিতেছিল বাধা দিয়া বৃদ্ধা আস্তে আস্তে কহিলেন।

"বিন্ধ্যের বয়স হয়েছে, শ্রাদ্ধের পরে অপকর্ষ করে 'ওকে বিয়ে দিতে হবে মনে থাকে যেন, তিন মাসের মধ্যে, শুনলে গোপাল''?—

রামলোপাল বাবু কহিলেন "আজ্ঞে হাঁ মা" !—নৃত্যকালী একটু খটকার মধ্যে পড়িলেন—এই অবস্থায় সপিণ্ডীকরণ অপকর্ষ হইতে পারে কি না,সম্প্রতি তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন, অথচ মাতৃদেবীর মৃত্যুকালীন আদেশ ! বৃদ্ধা পুত্রের চিন্তাবিষণ্ণ মুখ দেখিয়া কহিলেন —"নেত্য ওতে ভাববার কিছু নেই, বর্দ্ধমানা মেয়ের বিবাহের জন্য অপকর্ষ করবার ব্যবস্থা কর্ত্তাও দিতেন, বাবাও দিতেন, পিতামহীর অপকর্ষ করে আমাদের জ্ঞাতি ঘরেই মেয়ের বিবাহ হয়েছিল।" *

---

* এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্বে অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানেও কোন 'কোন' স্থানে প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা সর্ব্ববাদি সম্মত নহে,ইতি লেখক।

বৃদ্ধা একটু দম লইয়া কহিলেন, "কেষ্টদা আজ একবার ঠাকুরদের বেশ করে সাজাও দেখি ভাই?"—কৃষ্ণকালী উঠিয়া গেল! বৃদ্ধা সেইখানেই থাকিবার অভিপ্রায় করিলেন দেখিয়া উপরে একটা চন্দ্রাতপ খাটাইয়া লওয়া হইল। ততক্ষণ—কবিরাজ মহাশয় আরও একটা চতুর্ম্মুখযোগের বন্দোবস্ত করিতে লাগিয়া গেলেন। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া প্রতিবেশীগণ মাটিতে লুটাইয়া মাঁটির ধূলা মাথায় মাখিয়া বৃদ্ধার জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে কিয়ৎকালের জন্য আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের আরতির কাসর ঘণ্ঠা বাজিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে গ্রামের সকল স্ত্রী পুরুষ—ঠাকুরের আঙ্গিনায় আসিয়া জড় হইল, আজ তাহারা ঠিক আরতি দেখিতে আসিয়াছে কি না সেই কথা বলা কঠিন। শ্রীমন্তপুরের আবাল বৃদ্ধ শিরোমণি গৃহিণীকে দেবতার মত ভক্তি করিত, মাতার মত ভালবাসিত, আর গুরুর মত শ্রদ্ধা সহকারে আদেশ পালন করিত। সেই দেবী আজ ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—এজীবনে আর এমনটী কেহ কখন দেখিবে না, এমন মধুমাখা সম্ভাষণ কেহ কখন শুনিবে না, এবং এমন অকৃত্রিম স্নেহমমতা কেহ কখন পাইবে না, তাই আজ দেবতার আরতির সঙ্গে সঙ্গে এই মর্ত্ত্য দেবতার শেষ আরতি চরণবন্দনা ও চরম দর্শনের জন্য সারা শ্রীমন্তপুর ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।



দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণকালী ক্ষিপ্রহস্তে বিগ্রহগুলি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরতির প্রদীপ হাতে লইয়া দাঁড়াইল। আজ মদনমোহনের চমৎকার শোভা হইয়াছে, বিন্ধ্যবাসিনী কএক ছড়া ফুলের মালা বিকাল বেলাই গাঁথিয়া রাখিয়াছিল,—এক এক ছড়া মালা কৃষ্ণকালী মদনমোহন, রাধারাণী ও মা দশভুজার গলায় পরাইয়া দিল।

ঠাকুরদেবতার যত সাজ সজ্জার আয়োজন শিরোমণি মহাশয়ের ঘরে ছিল, কৃষ্ণকালী ঠাকুরমার ইহজীবনের শেষ সাধ মিটাইবার জন্য সবগুলি সাজই দেবতার অঙ্গে তুলিয়া দিল,—একটা প্রদীপের স্থানে আজ দশটা প্রদীপ জ্বলিল। আরতির ধূপের গন্ধে নৈশ আকাশ ভরিয়া উঠিল। কাঁসর ঘণ্টার তাললয়বদ্ধধ্বনি—বায়ু-তরঙ্গে মিশিয়া দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধার ক্ষীণদৃষ্টি দেবতা গৃহের ভিতর পর্য্যন্ত যাইয়া শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতে পারিতেছিল কিনা বলা যায় না! আর তাঁহার যত্ননিঃসারিত দর্শ-নেন্দ্রিয়—সেই দিকেই যে ধাবিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বৃদ্ধার চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ওষ্ঠ তখন শুষ্কপ্রায়,—ক্ষীণ দুটী ধারা নির্গত হইয়া অন্তরের সাত্ত্বিক ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছিল মাত্র।

আরতি অনেকক্ষণ হইল। গ্রামের লোক সকলেই একইভাবে দাঁড়াইয়া, রামগোপাল বাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধার ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। আর এই পরিবারের অতীত ও বর্ত্তমান

আপনার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে—অদূর ভবিষ্যতের অনতিস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন।

আরতি শেষ হইতে চলিয়াছে, বড়বৌ আর বিন্ধ্য বৃদ্ধার শয্যা-পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন।—বড়বৌ সহসা বৃদ্ধার চোক কপালে উঠিয়াছে দেখিয়া রামগোপাল বাবুকে ডাকিবার জন্য বিন্ধ্যকে ইঙ্গিত করিলেন। রামগোপাল বাবুও ঠিক্ একই সময় বৃদ্ধার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন, রামগোপাল বাবু চিৎকার করিয়া উঠিতেই নৃত্যকালী ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিলেন, সদানন্দ সেন কাছেই ছিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া দেখিলেন—আরতি শেষের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধার শেষবায়ু ধূপের গন্ধভারমন্থর নৈশ পবনের সহিত মিশিয়া গেল।

সবশেষ! শ্রীমন্তপুরের সমাগত নরনারীগণ ধূলায় লুটাইয়া পুণ্যবতীর শোকে রোদন করিতে লাগিল, বিন্ধ্য, কৃষ্ণকালী ইহারা একমত চেতনাহীন হইয়া শয্যাপার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল। বড়বৌ শাশুড়ীর পা দু'খানি বুকে জড়াইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যকালী মুখে সময়োচিত ঈশ্বরনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—হাতে গঙ্গাজল গঙ্গামৃত্তিকা মিশাইয়া জননীর সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন,—আর চোখে সপ্ত সমুদ্রের জল একত্র করিয়া জননীর শয্যাতল ভাসাইতেছিলেন।

রামগোপাল বাবু বজ্রাহত প্রাণীর মত নিশ্চল হইয়া ঠায় বসিয়া রহিলেন, হৃদয়ের তাপে বুঝি বা তাঁহার চোখের জলও শুকাইয়া গিয়াছিল। সকলেই আশা করিতেছিলেন, ভোরের এদিকে

বৃদ্ধার কিছু হইবে না, কিন্তু হঠাৎ এরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু হইবে বলিয়া কবিরাজ মহাশয়ও অনুমান করিতে পারেন নাই।

এইরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু সেই গ্রামে কেহ কখনও দেখে নাই, তাই সকলে একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পুত্র পৌত্র ও পুত্র-বধূগণ যাঁহারা বিদেশে ছিলেন তাঁহারা আসিয়া দেখিতে পাইলেন না বলিয়া অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। নৃত্যকালী সেই সকল চিন্তা করিবার সময় পাইতেছিলেন না, শোকে ও কর্ত্তব্যের গুরুভারে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বড়বৌ মাঝে মাঝে চিন্তা করিতেছিলেন "হায় হায় ঠাকুরপোদের দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।"—কিন্তু রামগোপাল বাবু ভাবিতেছিলেন ছেলেদের মুখ দেখিবার ভয়েই বুঝি মা এত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন।

দশদণ্ডের আরও কিছু বেশী সময় প্রতীক্ষা করিয়া বৃদ্ধার শব শ্মশানে লইয়া যাইয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া চিতায় তুলিয়াছিলেন, দাহ শেষের সঙ্গে সঙ্গে রাত্রিও শেষ হইয়া গেল, ভোরের ট্রেণে জয়কালী বাবু পৌঁছিয়াই জননীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইলেন, তিনি সেই সংবাদে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্মশানের দিকে ছুটিলেন—আর চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মাগো, তোর অধম সন্তানের মুখ দেখ্‌বিনি বলেই বুঝি এত শিগ্‌গির গেলে জননি, অভিমান করে চলে গেলে মা!"—জয়কালী বাবুর মর্ম্মভেদী বিলাপধ্বনি প্রভাতের সদ্যোজাগ্রৎ পক্ষীদিগের মধুর সঙ্গীতরব ছাপাইয়া উঠিয়া দূর দূরান্তরে একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনি ছড়াইয়া দিতেছিল!—

(৮)

৭টার ট্রেণে জয়কালীবাবু দেশে যাত্রা করিলে সেই রাত্রেই ২খানা পত্র এবং একখানি টেলিগ্রাম তাঁহার নামে আসিয়া পৌছে। পত্র ও টেলিগ্রামের মর্ম্ম একই কথা, "জননী মুমূর্ষু চলিয়া আস"! খালি বাসায় রামকালী বাবু পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়া বড়বৌএর উদ্দেশে অনেকগুলি শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন,—দুর্ভাগ্য এই যে সে সকল বাণ মন্ত্রশক্তির অভাবে যথাস্থানে পৌছায় নাই, বিষয়টা যে নিতান্ত প্রবঞ্চনামুলক এবং তাহা যে সহজেই ছোটবাবুর কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এই গর্ব্বে ছোটবাবু সে দিন রাত্রে দোকানের কাটা মাংস খরিদ করিয়া আনিবার জন্য ভৃত্যকে একটা টাকা দিলেন,—এবং মেজবৌকে লুচি করিবার ফরমাস্ দিয়া ছোট বৌএর ঘরে যাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মেজবাবু যে এখনো কতটা সেকেলে রহিয়া গিয়াছেন এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছোটবাবু নিজ বুদ্ধিরই বারে বারে তারিপ করিতে ছিলেন। কিন্তু কি জানি কেন ছোটবৌএর মন প্রবোধ মানিতে ছিলনা—ছোটবৌ শেষ রাত্রে শাশুড়ীর সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—বেলা ১০টার সময় জননীর মৃত্যু সংবাদবাহী টেলিগ্রাম রামবাবুর সকল গর্ব্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া সেই দিনেই সপরিবারে তাঁহাকে দেশের দিকে টানিয়া লইয়া গেল!

বৃদ্ধার মৃত্যুকালীন অভিপ্রায় মত পাঁচশত টাকার মধ্যেই

তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ছোটবাবু এ সকল কথা লইয়া তর্ক তুলিয়াছিলেন, সে সকল তর্কের তিক্ততা রামগোপাল বাবুকে ও স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধ নিয়া একটা অপ্রিয় বাক্‌বিতণ্ডা হওয়া মেজবাবু পছন্দ করিতেছিলেন না বলিয়াই সে সময় তর্কটা তখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু মেজবৌএর ইন্ধন যোগাইবার নৈপুণ্যে ছোঠবাবুর হৃদয়ে একটা বিদ্রোহবহ্নি ক্রমে জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

ছোটবাবু কোনমতে এই কয়দিন তাহার তাপ সহ্য করিয়া রহিলেন। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই অন্দর মহলে নানারকমের তুফান উঠিবার সূচনা হইতেছিল, ছোটখাট বাতাস বৃষ্টি যে না হইয়া যাইতেছে এমন নহে। তবে বড়বৌ যত রকমের সহিষ্ণুতার সংবাদ অবগত ছিলেন কার্য্যক্ষেত্রে তাহার সকলগুলিই ব্যবহার করিতে ভুলিলেন না ফলে তাঁহাব অসীম ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্যে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত একপ্রকার শান্তি রক্ষা হইল বটে—কিন্তু শ্রাদ্ধের পরে আর তাল সামলাইয়া চলা কাহারো পক্ষেই সহজ রহিল না।

অন্দরে মেজবৌএর উর্ব্বর মস্তিষ্কে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত, বাহিরে ছোটবাবুর অসংযত বাক্যে ও ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পাইতেছিল। এই সকল বিরোধের মূল নিদান অনুসন্ধান করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরাশ হইতেন, কিন্তু ছোটবাবুর সিদ্ধান্ত ছিল অন্যরূপ। তিনি ইদানীং একমত খোলা রকমেই



সন্দেহের সকল কারণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন রাম-গোপাল বাবু এবং তিন ভ্রাতা একত্র বসিয়া পারিবারিক প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন, কৃষ্ণকালী একটু দূরে বসিয়া শুনিতেছিল—সহসা ছোটবাবু বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"গোপাল দা,—বাবার উইল থেকে এপর্য্যন্ত আমাদের ঘরের কথা যা হয়েছে বা ঘটছে আপনি অবশ্যই তা জানেন এবং সেই জানাটা আমাদের চাইতেও বেশী, আর এসকল ঝঞ্ঝাট হয়ত ইচ্ছা করিলে আপনি তখনই মিটিয়ে দিতে পারতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য"—ছোটবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া ফেলিলেন, মেজবাবু কহিলেন, "রাম, গোপালদাকে এনে ওতে জরাচ্ছ কেন ভাই? গোপাল দা আমাদের হিতছাড়া কখনো অহিত করেন নি।" ছোটবাবু কহিলেন "সেত জানি, কিন্তু কার্য্যগুলো ঠিক হিতৈষীর মত হয় নি। বাবা কলেরা হয়ে মারা গেলেন—সংবাদ পেলাম কএক ঘণ্টা আগে, চেষ্টা করলে প্রথম অবস্থাতেই সংবাদ দেওয়া চল্‌তো। একটা উইল হলো, সেটা সাপ কি ব্যাঙ্‌ এপর্য্যন্ত কিছুই জান্‌তে পেলাম না। শ্রাদ্ধের টাকা পাঠান হলো সে গুলো মাকে দিয়ে ফেরত দেওয়ান হলো, অথচ টাকা গুলো কোথা যে গেল, তার টিকিটিও দেখা গেলনা।" রামগোপাল বাবু কহিলেন, "রাম আমায় অনুযোগ দিচ্ছ দাও, কিন্তু আমি জ্ঞাতসারে এর একটা কাজও নিজে করিনি। কর্ত্তা পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, তাঁর হৃদয়ের কথা খুলে বলতেন কখনও দুচার কথা জিজ্ঞাসা করতেন সাধ্যমত উত্তর করেছি। বিশ্বাস করতেন বলে উইল করে

আমার হাতে রেখে গেছেন, সেই উইল তাঁহার শ্রাদ্ধের পরই তোমাদের দিতে চেয়ে ছিলুম, তোমরা তখন নেওনি। কর্ত্তার কলেরা প্রকাশ পাওয়া মাত্র সংবাদ দেওয়া হয়েছে তোমরা একটু দেরীকরে এসেছিলে বলে দেখা পাওনি, এক্ষেত্রে নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান ঠিক তোমাদের মত লোকের সঙ্গত নয়। মা যে তোমাদের টাকা ফেরৎ দিয়াছিলেন, সেটা তোমার মার নিজেরই মনের তেজে, কারুর পরামর্শে নয়, আমি তখনও সহরেই ছিলাম।" ছোটবাবু কহিলেন, "গোপালদা আপনি রাগ করবেন না ধরুণ একটা উইল হয়ে গেল—আমরা তা জানতেই পারলামনা, বড়দা জ্যেষ্ঠ হ'লেও পৈতৃক বিষয় আশয় নিয়ে কথা। এখানে একটু সতর্ক থাকা সকলেরই দরকার।" মেজবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা দরকার বৈ কি একথা গোপালদাকে আর তোমার শেখাতে হবেনা!"

ছোটবাবু আবার কহিলেন, "আচ্ছা এই যে মা মারা গেলেন, এত আর কলেরায় নয়, এ সংবাদটাত আগে দেওয়া চলত। এসকল কাজ আগে থেকে পরামর্শ করেই করা হয়েছে, মা তাঁর সমস্ত টাকা গহনা, বড়দার পরিবারদের দান করে গেলেন, আর আমরা একটা কানা কড়ার ও ভাগী হলুমনা,—এটা কি কম আপশোষের কথা? থাক্‌না ওর হাজার টাকা, তবু মেজদা যে তাঁর একটু চূণের ভাগী হলেন না, ওতে কি ওঁকে সন্তানের ন্যায় সঙ্গত দাবী থেকে বঞ্চিত করা হয়নি? ওটাকি একটা মর্ম্মভেদী অপমান নয়? বড়দা

কি এতটা প্লেন করে কাজ করতে পারেন ? ওতে যে দু'একটী পাকা মগজের খেলা রয়েছে—সেত নেহাৎ অন্ধ ও দেখতে পায়।

জ্যেষ্ঠ নৃত্যকালী নীরবে শুনিতেছিলেন আর অশ্রু ত্যাগ করিতে ছিলেন। কৃষ্ণকালীর কৈশোর শোণিত কাকাবাবুদের মিথ্যা দোষারোপের অপমান চাঞ্চল্যে—এক এক বার ধমনী ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল,—মেজবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন,—"যতই বল রাম—আমাদের বিরুদ্ধে বাবা ও মার মন বিষাক্ত করে তুলবার সাহায্য গোপালদার দ্বারা একটুকু'ও হয়নি। গোপালদা সেধাতের লোকই নন"।—মেজবাবু পুনরপি একটু হাসিলেন।

রামগোপাল বাবু কহিলেন,—"না জয় ! আমাদ্বারাই তোমাদের পিতামাতার মন বিষাক্ত হওয়ার সাহায্য ধরতে গেলে অনেকটা হয়েছে। শুনবে কি ? শুনতে ভাল লাগবে কি ?— আমি যেদিন তোমাদের হাতে ধরে একমত জোরকরে সহরে নিয়ে যাই মনে পড়েকি ? নিজের বাসায় ভাত দিয়ে অনেকটা নিজের খরচে ইংরাজি পড়িয়ে শেষটায় দশদিন সাহেবের দোরে একমত হত্যা দিয়ে তোমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেই— ধরতে গেলে সরল বিশ্বাসী সদাচার ব্রাহ্মণদম্পতীর মন সেই দিন থেকেই তোমাদের প্রতি বিমুখ হতে আরম্ভ হয়েছিল, কর্ত্তা সবটা জেনে যেতে পারেননি। মা তেমাদের মানসিক ও নৈতিক অধঃপতন জেনেই তোমাদের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ হয়েছিলেন, ধরতেগেলে আমিই তার মূলে বিদ্যমান। এরজন্য অনেক অনুতাপ সহ্য করেছি, অনেকখানি চোখেরজল

ফেলেছি—সেকি মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা! ইদানী বৃদ্ধা তোমাদের পতিতের মত জ্ঞান করতেন আর মর্ম্মে মর্ম্মে তিল তিল করে মরতেন—সেদিন তাঁর সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ্য মৃত্যু হয়েছে-মাত্র। আর বল্‌বোনা বুক্ ফেটে বায় রাম!—কি অবস্থায় বৌমাদের নিয়ে সহরে চলে গেলে মনে হয় কি?—আবার বল্‌ছ সংবাদ পাওনি?—এতদিন ভাবতুম মা বুঝি তোমাদের সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে ভাব্‌ছেন্,— কিন্তু হায় আজ যা দেখলুম, তাতে মনে হয় ব্রাহ্মণকন্যা যথার্থ বুদ্ধিমতী, যথার্থ মনস্বিনী ছিলেন। তাঁর চিন্তা, কল্পনা, এবং সিদ্ধান্ত,— কলিতে ঋষিতুল্য ছিল! হায় মা"!— রামগোপাল বাবু উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকালী ও জয়কালী বাবু আসিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন, —জয়কালী বাবুর মুখ লজ্জায় ম্লান, রামকালী বাবুর চোখ দুটী অমানুষিক তেজে জ্বলিতেছিল।—রামগোপাল বাবু একটু সামলাইয়া লইয়া, জয়কালী বাবুর পায়ের ধূলা হাতে করিয়া মাথায় লইতে লইতে কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, রাম! ক্ষমা কর জয়! আমি জীবনে যা ভাবিনি, জীবনে যা প্রকাশ করে মুখে বলিনি, আজ হঠাৎ তোমাদের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হয়ে তাই ভেবে ফেলেছি, তাই বলে ফেলেছি, আমার বাবার ভাগ্য ছিল, তোমাদের দু'টী ভাত দিতে পেরেছি সে কথা আজ পাপ মুখে উচ্চারণ করে,—যথার্থ অপরাধী হয়েছি, জানিনা আমার এই পাতকের কি শাস্তি!"—

আমি এই বার শেষ কথা বলে যাচ্ছি, আমি তোমাদের কোন কিছুতেই নেই। এই উইল নিয়ে যাও, আর মা যা আমার কাছে রেখে গেছেন, তা একটুখানি বাদেই এনে দিচ্ছি!—কিন্তু এ কথা ঠিক জেন, আমি তোমাদের কোন অনিষ্ট ইচ্ছা করে কখনো কিছু করিনি। তোমরা তাঁর গর্ব্ভে জন্মেও দুর্ভাগ্য বশতঃ যাকে চেননি, এই হীন সন্তান তাকে কতকটা চিন্‌তে পেরেছিল, সে তেজ, সে প্রতিভা, সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সংসারে বড় বেশী দেখা যায় না। থাক্‌লেও দেখ্‌বার ভাগ্য সকলের ঘটে উঠে না। হায় মা,—আমার দায়িত্ব আজ থেকে শেষ হলো, যেখানেই থাক মার্জ্জনা করো মা।"

জয়কালী বাবু কহিলেন "আজ থাক্‌ গোপালদা?"

রামগোপাল বাবু কহিলেন,—"না ভাই আমি খালাস?"

রামবাবু কহিলেন,—"গোপালদা! আপনাকে আমি কিছুই মন্দ বলিনি তবু যদি আপনি রাগ করেন, তবে নাচাড়!"—

রামগোপাল বাবু কহিলেন,—"এই উইল কর্ত্তা অনেক চিন্তা করে তৈরি করেছিলেন, মা'র ওতে সম্মতি ছিল, নেত্য ওর কিছুই জানেন না।—তোমরা পড়ে দেখতে পার। "আর পড়ে দেখ্‌লে ছাই হবে"—এই বলিয়া রামবাবু দ্রুতপদে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন, অর্দ্ধ পথে ঠিক যেখানে অন্দর ও বাহির বাড়ীর সীমা রেখা মিশিয়াছে সেখানে মেজবৌ অতি সন্তর্পনে দাঁড়াইয়া বাহির বাড়ীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। রামবাবুকে দেখিয়াই তিনি বিরক্তি সহকারে কি

যেন অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন, ইদানীং মেজবৌএর মন্ত্রশিষ্য রামবাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া সমান বেগে বাহির বাড়ীতে বৈঠকখানায় চলিয়া আসিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা পাঠ করুন!'

রামগোপাল বাবু উইলখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন—

"লিখিতং শ্রীচন্দ্রশেখর শর্ম্মা শিরোমণি"—"নানা, ওসব রেখে দিন সর্ত্তগুলো পড়ুন"—রাম বাবুর যেন তর সহিতেছিল না। রামগোপাল বাবু পড়িতে লাগিলেন,—"আমার পৈতৃক গৃহদেবতা এবং টোল যাহাতে রীতিমত রক্ষিত হয় সেই জন্য আমি এই নিয়ম করিতেছি যে আমার পুত্র পৌত্র প্রভৃতির মধ্যে যে শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া টোল রক্ষা করিবে, এবং শ্রদ্ধার সহিত গৃহদেবতার সেবা পূজা করিবে সেই আমার বসত ভিটার দশ আনা অংশ এবং স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির বার আনা অংশ প্রাপ্ত হইবেক।

টোলের ছাত্রগণ যাহাতে আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যা লাভ করিতে পারে, আমার ত্যক্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ হইতে তাহার ব্যবস্থা হইবে। বসত ভিটার দশ আনা অংশে গৃহদেবতা টোল ও সেবাইত অধ্যাপক বাস করিবে, আমার অন্য পুত্র বা পৌত্রগণ বসত ভিটার ছয় আনা ও আমার ত্যক্ত সম্পত্তির চারি আনা অংশমত প্রাপ্ত হইবেক। প্রকাশ থাকে যে আমার পত্নীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত উক্ত বসতভিটা এবং সমুদয় সম্পত্তি তাহার অধীনে তাহার ইচ্ছা মত পরিচালিত হইবে। তিনি যদি এই

উইলের কোনও প্রকার ব্যতিক্রম করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে আমার মৃত্যুর পরে তাহাও আমারই কৃত নিয়ম বলিয়া বলবৎ গণ্য হইবে।"—

রামবাবু চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"যথেষ্ট হয়েছে গোপালদা, যথেষ্ট হয়েছে—একটা মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাছে আমরা হেরে গেলুম।—যদিও আর একটা এমনি মেয়ে মানুষ এমনি বুদ্ধি লয়ে আমাদের সতর্ক করে দিতে চেষ্টা কর্‌ছিল,— কিন্তু মেজদার গাফিলিতে আমরা চোখ চেয়ে একবার দেখ্‌তে পেলুম না,—ব্যাপারটা কি?—এখন আর ও শুনে কি হবে? পৈতৃক বিষয়, বাস্তুভিটা এ সকল থেকে বঞ্চিত হয়ে শৃগাল কুকুরের মত রোজ কামাই করে রোজ খেতে হবে! ধিক!"

জয়কালী বাবুর মুখের দিকে এমনি একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ-পাত করিয়া রামবাবু কথাগুলির পরিসমাপ্তি করিলেন যে শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারও ধৈর্য্য লুপ্ত হইয়া গেল!—তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"এতটা হবে জান্‌তুম না"—নৃত্যকালী একটু লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"বাবা কি একটা উইল করে গেছেন এই মাত্রই জানি, এর বিন্দুবিসর্গও আমি জান্‌তুম্ না।" রামবাবু কহিলেন,—"আপনি নাও জান্‌তে পারেন, জান্‌লে এতটা সুবিধা নিজের পক্ষে নাও হতে পার্‌ত! আমাদেরই বরাত মন্দ!— মেজদা, এখন কি করবেন?—পৈতৃক বিষয়, বাস্তু ভিটা, মা'র গহনা, নগদ, এ সব থেকেইত বঞ্চিত হলুম এখন রাস্তা দেখ্‌তে হয়!"—

নৃত্যকালী অপমানে বিশেষতঃ খালি বাড়ীতে নিজের স্বার্থপূর্ণ উইল সম্পাদন হওয়ায় লজ্জায় একেবারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিলেন। রামগোপাল বাবু কহিলেন,—"উইলের অবস্থা আমি জানতুম—এ সকল বিভাগ করাতে যে তোমাদের মনে কষ্ট হবে সে কথাও আমি বলেছি,—কর্ত্তাও জান্‌তেন তবু তিনি করে গেলেন,—তিনি শুধু এই কথা ক'টী বলে গেলেন—যে জয় আর রাম তারা আমার ঠাকুর ঘরে বা টোলের আঙ্গিনায় ফিরে আস্‌বে না, তাদের ছেলেরাও না, তারা যে রস পেয়েছে ওছেড়ে এই দরিদ্রতাকে নিয়ে তারা কখনও সুখ পাবে না। তা ছাড়া তাদের কষ্টও হবে না, বসত ভিটার জন্যও তাদের আট্‌কাবে না, তারাত বিদেশেই থাক্‌বে, এই নির্জ্জন—ভোগবিলাস শূন্য—পল্লীর ভিটা কাম্‌ড়ে থাক্‌বার মত সখ্ তাদের কোন পুরুষেই হবে না।"

রাম বাবু কহিলেন,—"গোপালদা, এর একটা মুখরোচক ভূমিকাও যে আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাক্‌বে সে আশা সকলেই করেছি। তবে এখন বিদায় চাই!"

রামগোপাল বাবু কহিলেন,—"এত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন ভাই? লেখাপড়া শিখেছ, দু'পয়সা কামাই করতে পার, একটু ধীরস্থির হয়ে বিষয়টা ভেবে দেখ, কর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল—তাঁর গৃহদেবতার সেবা পূজা যা'তে বেশ ভালমত নির্ব্বাহ হয়, আর এই এত কালের টোলটা উঠে না যায়।"

বাধা দিয়া রামবাবু কহিলেন, "বুঝে দেখ্‌বো ভাই, দুবেলা

ভাত দিয়ে মাসে পাঁচটা টাকা মাইনে দিলে পূজারী বামুনের ঝাঁক এসে পড়্‌ত, আর খামারের যা ধান হয় ঐ দিয়ে তার উপর মাসে ৩০টী করে টাকা ধরে দিলে অনেক বিদ্যাবাগীশের দল এসে টোল করে বস্‌তে চাইত, একটু কষাকসি কর্‌লে ঠাকুরসেবার ভারটাও চাপাতে পারা না যেত এমন নয়।—এ ত উইল নয় একটা চক্রান্তমূলক দাঁরুণ বঞ্চনা!"—

মেজবৌ এ সকল স্পষ্টরূপেই শুনিয়াছিলেন, তিনি ছোটবৌকে ডাকিয়া সকল অবস্থা সবিশেষ বুঝাইয়া দিয়া অদ্যই বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিয়া বড়বৌএর উদ্দেশে যত প্রকারে সম্ভব কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বড়বৌ সমস্ত শুনিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তিনি এ পর্য্যন্ত জানিতেন না কর্ত্তার উইলে কি আছে। শাশুড়ীর দানটাও যে সঙ্গত হয় নাই বরং ইহা লইয়া যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইবে বুদ্ধিমতী বড়বৌ তখন হইতেই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু বড়বৌ শাশুড়ীর টাকাগুলি নিজের মেয়ের বিবাহের জন্য খরচ করিতে কেমন লজ্জা বোধ করিতেছিলেন, আবার কি করিয়া যে বিন্ধ্যের বিবাহ দিবেন, তাহাও তিন মাসের মধ্যে, সেই ভাবিয়া ব্যাকুলও হইতেছিলেন, এখন যদি এই টাকাগুলি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে কি উপায় হইবে? বড়বৌ কি এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিবেন্ না? স্বার্থ ত এতটুকুই নয়, সে ত আজ দেবতার আশীর্ব্বাদে অনেকখানি তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিয়াছে, তিনি কি যথার্থ

দানকে অস্বীকার করিয়া রাস্তায় দাঁড়াইবেন?—বড়বৌ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তিনি নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় যাইয়া শরীর এলাইয়া দিলেন, তাঁহার চোখে তখন জল পড়িতেছিল, বিন্ধ্য দূরে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল, সে সরলা বালিকা বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহার জননীর হৃদয়ে আজ কি দারুণ ব্যথা বাজিয়াছে—কি ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে।

বড়বৌ ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে কহিলেন, "দেবতা, জানি না কোন দোষ করেছি কি না, যদি কোন দোষ করে থাকি, তবে শাস্তি দাও, আর যদি তোমার সেবা করে থাকি, তবে সেই অধিকার থেকে কোন দিন বঞ্চিত করো না ঠাকুর! দুঃখকে যেন তোমার নাম নিয়ে বরণ করে নিই,—তবু নীচ স্বার্থকে নয়!" বড়বৌ অনেকক্ষণ সেখানে পড়িয়া রহিলেন,—বিন্ধ্য গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল,—

—"আমি কি দুখেরে ডরাই?"—

এ দিকে রামবাবু একটু আইনের আভাস দিয়া বিষয়টা যে নেহাৎ খেলো, অথচ বেআইনি তাহাও বুঝাইয়া বলিতে কসুর করিলেন না। এই শ্রেণীর উইল যে আইন অনুসারে টিকিতে পারে না, তাহার নজিরও দু'চারিটা দেখাইতে ক্রুটী করিলেন না। নগদ টাকা এখনও তৃতীয় ব্যক্তির হাতে আমানত রহিয়াছে—মামলা খাড়া করিলে উহা অবশ্যই হাতে আসিতে পারে, তবে কিনা এই নিয়া আদালতে যাইবেন কি না তাহা এখনও ঠিক বলিতে পারেন না।

এ বিষয় জয়বাবুর কি মত তাহা জানিবার জন্য রামবাবু তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন, জয়বাবু কহিলেন, "রাম, যাই হোক বাবা মা যা করে গেছেন তা আমাদের মান্‌তে হয়!" রাম-বাবু আগে ভাবিতে পারেন নাই মেজদা এমন একটা বেসুরো ভাজিয়া বসিবেন, তিনি চটিয়া গিয়া কহিলেন,—"সে আপনি উপেক্ষা কর্‌তে পারেন, আমি পারি না, বিশেষতঃ আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি এ বাড়ীতে বাবা মার নাম করে করে অনেক অসম্ভব সম্ভব করা হয়েছে। অনেক অন্যায়কে ন্যায় বলে খাড়া করা হয়েছে, —অনেক বঞ্চনাকে সত্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে—!—মেজদা, ত্যাগই এক কথা, আর প্রতারিত হয়ে দেশ ত্যাগ করাই অন্য কথা" !—

রামগোপাল বাবু কহিলেন, "রাম আইনের তর্ক এখানে খাটবে না, আইন, অধিকারীর সঙ্গত ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারবে না। এ উইলের উদ্দেশ্য কাউকে বঞ্চনা করা নয়, ইচ্ছা কর্‌লে তুমিও সর্ত্ত পালন করে দাবীদার হতে পার। আর মা'র নগদের কথা বলছ, তাও জোর করে বা আইন করে কেড়ে নিতে পারবে না, কবরেজ ম'শায় আমি আরও অনেক লোকের সাম্‌নে মা সজ্ঞানে তা দিয়ে গেছেন, কেড়ে নেওয়ারও জো নেই, কাজের কথা থাক্‌লে বল ভাই—?"—

কৃষ্ণকালী সহসা রামগোপাল বাবুর দিকে চাহিয়া অকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"জ্যেঠা, আমার একটা কথা বল্‌বার ছিল—

"কি কথা বাবা ?"—স্নেহে রামগোপাল বাবুর চক্ষু আর্দ্র ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছিল। কৃষ্ণকালী কহিল,—"জ্যেঠা গ্রহীতার অজ্ঞাতে বা অনাগ্রহে কেহ যদি দান করেন, তবে সেই দান গ্রহণ করা না করায় গ্রহীতার স্বাধীনতা আছে কিনা ?"—

রামগোপাল বাবুর হৃদয় সহসা দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল, এ কি প্রশ্ন আজি, এ কিশোর কৃষ্ণকালীর মুখে শুনিতে পাওয়া গেল ? —রামগোপাল বাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এ ত বড় কঠিন প্রশ্ন বাবা ! দাতা যে উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য দান করেন, গ্রহীতার উপেক্ষায় যদি দাতার সে সাধু উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়, তবে সে স্থলে গ্রহীতার স্বাধীনতা ধর্ম্ম সঙ্গত কিনা তা বল্‌বার সাধ্য আমার নেই বাবা ?—এ প্রশ্ন আর কুড়ি দিন আগে কর্‌লে না কেন কেষ্ট ?"—"জান্‌তুম না জ্যেঠা, যে এর মধ্যে এত গলদ রয়েছে—। জ্যেঠা আমি ঠাকুরের আঙ্গিনায় যাচ্ছি, আপনি বাবাকে আর কাকাবাবুদের নিয়ে সেখানে একটু দয়া করে আসুন। এ প্রশ্নের উত্তর আমি এখনো পাব জ্যেঠা !"—কৃষ্ণকালীর চোখ দু'টী জলে ভরিয়া উঠিল সে দ্রুতপদে দেবতার গৃহের বারাণ্ডায় যাইয়া জননীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "মা, তুমি কি জান না যে ঠাকুরমা আমাকে কতখানি ভালবাস্‌তেন ?"—"জানি বৈকি বাবা !"—"সে কিসের জন্য মা ?—আমি শুধু পূজো কর্‌তে পারি বলে ?" "তা খালি হবে কেন বাবা ?"—"তবে আর কি মা ?" "আমি অত জানিনে বাপ্‌ !"

"জান বৈকি মা তুমি সব্ জান, তুমি যদি না জান্‌বে তবে আজ আমি কি করে জান্‌তে পারছি মা ?—তোমার রক্ত মাংস হৃদয়ে যে এ দেহ আর হৃদয় গঠিত মা !—মা তুমি বলে দাও, আমি কালে যা পারবো বলে ঠাকুরমা আমাকে তাঁর সকল কাজের ভার দিয়ে গেলেন আমি কি তা পার্‌বো না ?"—"কেন পার্‌বে না বাছা ?"—"তবে তুমি বলে দাও আমি সব পার্‌বো, দাদা মশায় আর ঠাকুরমা, যা কল্পনা করে গেছেন আমি শুধু দেবতার দয়া নিয়ে বিনিময়ে আর কিছুই না চেয়ে, বল মা, আমি সব করে উঠ্‌তে পার্‌বো ?—ভেবে বল মা, এতে তোমাদের হয়ত কষ্ট হবে, 'হয়ত' কি মা,—নিশ্চয় তোমাদের ঘোরতর কষ্ট হবে তবু বল, আমি পার্‌বো ?"—

জননী এইবার পুত্রের মুখের দিকে এক বার আর দেবতা বিগ্রহের দিকে একবার চাহিয়া কি এক অপার্থিব গৌরবে বুক ভরা ভরসার প্রেরণায় একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি সহসা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"পার্‌বে তুমি বাপ্ তুমি সব পার্‌বে, আমার হৃদয় বল্‌ছে তুমি পার্‌বে, তোমার হৃদয় বল্‌ছে তুমি সব্ পার্‌বে, আর সর্ব্বান্তর্যামী এই দেবতার নীরব ইঙ্গিত যেন বলে দিচ্ছে তুমি সব্ পার্‌বে। পারো বাবা তুমি সব পারো। তোমায় যারা সন্তান বলে পেয়েছে তারা তোমায় নিয়ে গাছের তলায় দাঁড়ালেও এক তিল কষ্ট পাবে না"—জননী আর বলিতে পারিলেন না, একটা প্রবল আগ্রহে বুকের ভিতর সন্তানটাকে

জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন। বিন্ধ্য এ সকল কথার মধ্যে ছিল না, সে মালা গাঁথিতেছিল আর গুণ্ গুণ্ করিয়া সেই শতবার গাওয়া গানের আবৃত্তি করিতেছিল—"আমি কি দুখেরে ডরাই" !—

দেখিতে দেখিতে জয়বাবু রামবাবু ও নৃত্যকালী ভট্টাচার্য্য রামগোপালবাবুকে নিয়া ঠাকুরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন, সকলে ঠাকুর প্রণাম করিয়া মাটিতে বসিলেন, বড়বৌ পুত্রকে বাহুমুক্ত করিয়া একটু ঘোম্‌টা টানিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন।—রাম বাবু বালকের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া একটু উদ্যোগী হইয়াই আসিলেন, জয়বাবু, ব্যাপারটার কঠোরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া একটু শান্তির আশায় ঠাকুরের আঙ্গিনায় সহজেই আসিলেন,—নৃত্যকালী আসিলেন একরূপ হতবুদ্ধি হইয়া।

নৃত্যকালী চিরকালই শান্তিপ্রিয় ছিলেন এখনো যাহাতে বিষয়টা সহজে মিটিয়া যায় তিনি সেই কামনাই করিতে ছিলেন, কিন্তু নিজের বুদ্ধির স্থূলতা নিবন্ধন স্ত্রী পুত্রের মনোভাব ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, প্রাপ্তটাকা ও সম্পত্তির এক কপর্দ্দক ত্যাগ করিলেও যদি স্ত্রী পুত্র বিরক্ত হয়! তাহারা কি এই দুঃসময়ের ভরসা টাকাগুলি এক কথায় ছাড়িয়া দিতে চাহিবে? এই যে বিন্ধ্য এত বড়টী হইয়াছে মা বলিয়া গিয়াছেন, তিন মাস মধ্যেই অপকর্ষ করিয়া তাহার বিবাহ দিতে হইবে, এই তিন মাসের মধ্যে খুঁজিয়া বর আনিতে

হইবে, টাকা খরচ করিয়া বিবাহ দিতে হইবে। এ সময় ঐ পাঁচ শত টাকার মূল্যত কম নহে। ইহার পর কৃষ্ণকালীকে নবদ্বীপ পাঠাইতে হইবে। অন্ততঃ পাঁচবৎসর কাল তাহাকে সেখানে রাখিয়া পড়াইতে হইবে। এই পাঁচ বৎসরের খরচও সামান্য পড়িবেনা। মা'র দেওয়া পাঁচ'শ টাকা ছেলে কি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে?

এই সকল চিন্তা করিয়া নৃত্যকালী মীমাংসার কোন পথই খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, তিনি অন্তরে অন্তরে একেবারে অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহার শুধু মনে হইতেছিল ঠাকুর যদি এমন দয়া করিতেন যে ছেলে ও স্ত্রী অকাতরে এসকল স্বার্থত্যাগ করিয়া তাঁহাকে এই মহা অশান্তির হাত হইতে এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত করিয়া দিত। আহা এমন সুমতি যদি নৃত্যকালীর স্ত্রী পুত্রের মনে ঠাকুরের কৃপায় জন্মিত,—এমন দয়াকি হয় না? এমন সুবুদ্ধি কি পৃথিবীর মানুষের হয় না? ঠাকুর, এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের দায় হইতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে মুক্ত করিয়া দাও দয়াময়!—নৃত্যকালী এমনও ভাবিতেছিলেন, ছেলে যদি কষ্ট সহিতে সম্মত হইত, তিনি না হয় ভিক্ষা করিয়া তাহাকে নবদ্বীপ হইতে পণ্ডিত করিয়া আনিতেন। দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া কটি ছেলেকে পৈতৃক ভিটায় নিজেরই একতৃতীয়াংশ ন্যায্য ভূমিতে কুটীর করিয়া শাকান্ন খাওয়াইতেন, আর ছেলের দ্বারা বিদ্যাদান করাইতেন!—এওত সংসারে হইয়া থাকে। বাপ্ দাদার কিছু না থাকিলেওত মানুষ নিজের যোগ্যতায় নাম কাম অর্জ্জন করিয়া ধন্য হয়।

বিন্ধ্যের বিয়ের জন্যই বা কিসের চিন্তা ? জমি যা অংশে পড়িবে তাহার ক'এক কাঠা বিক্রয় করিয়া তিনমাসের মধ্যে কি ওকে পাত্রস্থ করিতে পারা যাইবে না। ? খুবই পারা যাইবে। অই গৃহ দেবতার দয়া আর জনক জননীর আশীর্ব্বাদ থাকিলে অনায়াসে পারা যাইবে !—কিন্তু স্ত্রী পুত্র ! নৃত্যকালী দেবতার দয়ার আশায় একদৃষ্টে বিগ্রহের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।—বাড়ীর প্রায় সকলেই ঠাকুরের আঙ্গিনায় আসিয়া জড় হইল।

মেজবৌ ও ছোটবৌকে একটু দূরে আঁড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেও কেহ কেহ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কৃষ্ণকালী কি সব কথা বলিবার জন্য সকলকে ডাকিয়াছে ?—সে না জানি কি বলে !—সহসা কৃষ্ণকালী ঠাকুরের দিকে এক বার প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া জনক জননীর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকাইল, কিন্তু জনক জননীর মুখ অপূর্ব্ব প্রসন্ন গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে দেখিয়া বালকের মনে সাহস জাগিয়া উঠিল। সে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চস্বরে কহিল,—"জ্যেঠা, আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। দাদামহাশয়ের এই উইলের উদ্দেশ্য তাঁর টোলরক্ষা এবং গৃহদেবতার পবিত্র সেবা। তিনি এই কাজের ভার মুখ্যতঃ আমার উপরেই দিয়ে গিয়েছেন বুঝ্‌তে হবে। এই কাজে অর্থব্যয় আবশ্যক অথচ বর্ত্তমানে কোন অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই দেখে এইরূপ ভাগ করে গিয়েছেন,—ঠাকুরমার শেষ দানও ঠিক্ এসকল কাজেরই সহায়তামূলক সন্দেহ নেই !—

আমি যদি এসকল কাজ করতে সম্মত হই, তবে আমার জীবিকার একটা পথ করা চাইত? বোধ হয় এইটাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, নয় জ্যেঠা?"

রামগোপাল বাবু কহিলেন,—'তা ঠিক বাবা কর্ত্তা আর মা, এ সকল কথা স্পষ্ট করেই আমাকে বলেছিলেন।" কৃষ্ণকালী পুনরপি কহিতে লাগিল,—"মেজকাকা, ছোটকাকা আপনারাও শুনুন আমার মনে হয় দাতার মূল উদ্দেশ্য যদি আমি অতিরিক্ত ভাগ বা টাকা না নিয়েই সাধন করতে প্রস্তুত হই, তবে বোধ হয় আমি অপরাধী হবোনা।—

আমি বালক আমার সঙ্কল্প দৃঢ় করে নেবার জন্য আপনাদের ঠাকুর আঙ্গিনায় ডেকে এনেছি মাপ্ করবেন! আমি এই ঠাকুরের সাম্নে আর আমার পৃথিবীর প্রত্যক্ষ দেবতা জনক জননীর সাম্নে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, দাদামহাশয়ের উদ্দেশ্য সাধন করতে আমি প্রাণপনে চেষ্টা করবো, তার জন্য আমি ঠাকুরমার দেওয়া এক পয়সাও চাই না, এবং উইলের অতিরিক্ত ভূমি বা অন্য সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করবো না। বিন্দ্যার বিবাহের জন্য দেওয়া পাঁচশ টাকায় আমার কোন অধিকার জন্মেনি, বাবা যদি বলেন তবে আমি তিন মাস মধ্যেই ভিক্ষা করে হলেও ওর বিবাহ দিতে পারবো!—আমি পারবো জ্যেঠা আমি বালক হলেও আমি ঠাকুরমার কাছে অনেক শুনেছি, আমি পারবো। দুঃখ দারিদ্র্যকে আমি তুচ্ছ করে চলতে পারবো জ্যেঠা"—বালক কাঁদিয়া ফেলিল উচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে নৃত্যকালী চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কেষ্ট, কেষ্ট, আমিও পারবো বাবা, মার টাকা নাইবা হলো, বিন্ধ্যের বিয়ে হলেইত মা'র আদেশ পালন করা হবে! জয়, রাম, নাও উইল ছিঁড়ে ফেল, গোপালদা, টাকাগুলি ওদের দিয়ে দাও!—গহনার টাকায় ঠাকুর ঘরের ভিটা বাঁধাতে হয় বাঁধিও, আমি ওর এক পয়সাও খাবো না।"—রামগোপাল বাবু নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন—কৃষ্ণকালী কহিল "আমি তিন মাস পরেই নবদ্বীপ যাচ্ছি, আমি চার বৎসরে পড়া শেষ করে আস্‌বো, তিন মাস পরে বাবাও ঠাকুর পূজা কর্‌তে পার্‌বেন। কোন ভাব্‌না থাক্‌বেনা জ্যেঠা, আমি কিছু চাইনে জ্যেঠা—চাই শুধু দেবতার দয়া!"

বড়বৌ ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন আর সন্তানের গৌরবে শিহরিয়া উঠিতে ছিলেন। জয়কালী বাবু এতক্ষণ অবাক হইয়া কৃষ্ণকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, আর অন্তরের উচ্ছ্বাসে এক একবার অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন, রামবাবু ভাবিতেছিলেন "এইবার চাঁদ!" সহসা সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল—ছোটবৌ অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বড়বৌ'র দুটী পা জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র অশ্রুজলে পা ভাসাইয়া দিতেছেন। জয়বাবুরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কৃষ্ণকালীকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"গোপালদা জীবনে কখনো জনকজননীর আশীর্ব্বাদ বা দেবতার দয়া অর্জ্জন করতে পাইনি, আজ বংশের তিলক কেষ্টকে পেয়ে যথার্থ করেই লাভ করলুম,—তাঁদের মূর্ত্তিমান্ আশীর্ব্বাদ, আর দেবতার দয়া!"

রামবাবুর মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল, অন্দরে মেজবৌ স্বামীর মূর্খতায় রোষে ও ক্ষোভে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জয়বাবু ঠাকুরের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "দেবতা পথভ্রান্ত হয়ে অনেক ছুটেছি। জীবনে কোন পুণ্য করিনি, জনক জননীর পুণ্যের ফলে আজ কি ধন দিলে ঠাকুর, এযে স্বর্গের সম্পদ ! এযে যথার্থই "দেবতার দান !"

সমাপ্ত।

বিধবার বান্ধব।

(১)

দীর্ঘকাল দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগকরিয়া নিঃসন্তান হইলেও এই বয়সে সিঁথির সিঁদূর বজায় রাখিয়াছিলেন বলিয়া সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে ভাগ্যবতী রায়গৃহিণী একদিন সত্য সত্যই পরপারে চলিয়া গেলেন। রায় মহাশয় বিধিমত শোক প্রকাশ ব্যাপারে কৃপণতা না করিলেও অচিরাৎ বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পিতৃপুরুষের ভবিষ্যৎ জল পিণ্ডের অত্যাবশ্যাক বন্দোবস্তের দায়িত্ব যে অন্ততঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিজের ঘাড়েই বহন করিতে হইবেই সেই আভাস-টুকু প্রদান করিয়া গৃহিণীর শ্রাদ্ধ ব্যাপারে কিন্তু যথেষ্ট কৃপণতার সুসঙ্গত পরিচয় দেওয়ার সুযোগ করিয়া লইতে ছাড়িলেন না। গ্রামের দুই একজন ভাগ্যান্বেষী ভাবিলেন, "রায়মহাশয় বিবেচক লোক তাঁনা হইলে রোজ দুই পয়সার ছাতু খাইয়া এমন টাকার কুমীর হইতে পারিতেন না। মা কমলাকে এমনি করিয়াই সাধনা করিতে হয় আর সাধিলেই সিদ্ধি!"

কিন্তু এক শ্রেণীর লোকে মনে করিল যে রায় মহাশয় গৃহিণীকে বাঁচিয়া থাকিতে ও খাইতে দিলেন না, মরিয়া গিয়াও বেচারী পেট ভরিয়া জল পিণ্ডটুকু পাইল না!

রায়মহাশয়ের টাকা যখের আমলে আসিয়াছে। গ্রামের ছেলের দল কিন্তু যথার্থই ভাবিল যে বুড়ো শ্রাদ্ধে ও খাওয়ালে না বিয়েতে ও খাওয়াবেনা, বেটা আগা গোড়াই ফাঁকি দিলে" ! তা যে যাহাই ভাবুক রায়মহাশয় কিন্তু পরিবারের শ্রাদ্ধের পরদিন হইতেই নিয়মিত সময়ে কোন দিন কলা সিদ্ধ কোন দিন বা আলু সিদ্ধ ভাত নিজ হাতে রাঁধিয়া বেলা তুইটার সময় আহারান্তে পূর্ব্ববৎ তৃপ্তির উদ্গারে পাড়ার লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে ভাবিত এইবার রায় মহাশয়ের বেশ হজম হইতেছে।"

রায়মহাশয়ের পুরোহিত নিস্তুঠাকুর প্রথম প্রথম যুক্তি তর্ক দ্বারা ষাট বৎসর বয়সেও যে বিবাহ করা সংসারীর পক্ষে অসঙ্গত নহে এবং এরূপ বয়সের বিবাহের সন্তান সন্ততির দৃষ্টান্তও যে বিরল নহে তাহা অনেক বারই গোপনে গোপনে রায়মহাশয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া একদিন যথার্থই বুঝিতে পারিলেন যে রায়-মহাশয়ের দারান্তর গ্রহণের তাৎকালিক ইঙ্গিতের মূলে উপস্থিত কার্য্যে ব্যয় সংক্ষেপের ফন্দিছাড়া আর কিছুই ছিল না। একঘর যজমান এমন করিয়া ভাসিয়া যাইতে চলিল দেখিয়া বুদ্ধিমান্ নিস্তু ঠাকুর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি প্রায় প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যার রায়মহাশয়ের মত আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তনের চেষ্টায় তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

(২)

রায়মহাশয় কৃপণ হইলেও, লোক মন্দ ছিলেন না। তিনি পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন না এবং নিজের গুমরে নিজের মধ্যেই সংকুচিত হইয়া থাকিতেন। পরের কথায় যাইতেনও না পরকে বিশ্বাসও করিতেন না। তবে পুরোহিত ঠাকুরকে একটু খাতির করিতেন, এবং তাঁহার কথা শুনিতেন। এতদিন গৃহিণী ছিলেন, রায় মহাশয় তাঁহাকে জীবনের একজন অংশীদার মাত্র মনে করিতেন; এবং গৃহিণীর অন্নবস্ত্র যোগান, নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া নিজের খোরাকীর কিয়দংশ গৃহিণীকে বাটিয়া দিতেন। গৃহিণী প্রথম বয়সে একটু ভাল খাওয়া পড়ার আপত্তি করিলেও মিত ব্যয়িতা সম্বন্ধে স্বামীর অচঞ্চল দৃঢ়তা দেখিয়া শেষটায় নিজেই চুপ করিয়া থাকিতেন। তবে একটা সুবিধা এই ছিল যে, রায় মহাশয়ের খামারে কিছু ধান ছিল, গৃহিণী দুই জনের পেট ভরাইবার মত চাউল ভানিয়া নিজ হাতেই সিদ্ধ করিয়া লইতেন বলিয়া, অনাহারে প্রাণে মারা যাইবার আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু তবু গৃহিণীর সিঁথির সিঁদুরের বরাত জোরে স্বামীর শেষ বয়সে মুখে পানগুয়া লইয়াই তিনি মহাযাত্রা করিলেন। রায় মহাশয় বিপত্নীক হইয়া একটী নিরীহ সেবা পরায়ণা সঙ্গিনীর অভাব সংসারের দিক্ দিয়া কতকটা অনুভব না করিয়াছিলেন এমন নহে। তবে তিনি নিতান্ত দমিবার লোক নহেন, সেই জন্যই বৃদ্ধবয়সে গৃহশূন্য



হইয়াও নিজের আবশ্যক মত গৃহকর্ম্ম নিজ হাতেই গুছাইয়া করিতেন। রায় মহাশয় রাত্রে বড় ঘুমাইতেন না, দিনের বেলা কিছু ঘুমাইতেন। লোকে বলিত রায় মহাশয় সারা রাত্রি জাগিয়া টাকা পাহারা দেন। তা যেমনই হোক্ তিনি খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেন; প্রাতঃ কৃত্য সমাধা করিবার আগেও পরে দুই ছিলিম তামাক খাইয়া বেশ একটু চন চনে হইয়া ঘর উঠান ও তুলসী তলায় নিজের হাতেই ঝাঁট দিতেন। পাড়ায় একটী বৃদ্ধা রায় মহাশয়কে একটু ভক্তি করিত, যেহেতু আপদে বিপদে সে রায় মহাশয়ের কাছে হাত পাতিয়া নিরাশ হইত না; যদিও রায় মহাশয় যথা সময়ে মায় সুদ সকল টাকাই আদায় করিয়া লইতে ভুলিতেন না। সেই বৃদ্ধাটী দুই একদিন পর পর রায় মহাশয়ের তুলসী তলা ও রান্না ঘর খানি লেপিয়া যাইত। রায় মহাশয় পাওনা গণ্ডা আদায়ের চেষ্টায় সকালেই বাহির হইতেন এবং প্রায় একটার সময় ফিরিয়া আসিতেন। তখনকার তামাক ছিলিমের মূল্য বড় বেশী ছিল; ধীরে সুস্থে তামাক ছিলিম নিঃশেষে ভস্ম করিয়া মাথায় এক কুশ তৈল দিয়া রায় মহাশয় সেই সনাতন খড়ম জোরাটী পায় দিয়া চটাচট্ শব্দে পুকুর ঘাটে চলিয়া যাইতেন মুখ নাসিকা কর্ণও চক্ষু গহবর দশটী আঙ্গুলে বন্ধ করিয়া রায় মহাশয় দীর্ঘকালের জন্য একটী ডুব দিতেন, উঠিবাব সঙ্গে সঙ্গেই "জবাকুসুম সংকাশং" শব্দে তীরভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেন। রায় মহাশয় সূর্য্যের স্তব পাঠ করিতে করিতেই বাড়ী ফিরিতেন এবং রান্না ঘরে

যাইয়াই ভিজা কাপড় ছাড়িয়া দিতেন; গামছা তাঁহার ছিলনা কাপড়ের এক খুঁটেই গামোছার কাজ চলিয়া যাইত।

স্নানে যাওয়ার সময় রায়মহাশয় একটা মাঝারি রকমের কলসী লইয়া যাইতেন তাহার জলে একই সময়ে রান্নাও আহ্নিকের কাজ সমাধা হইত। এইত মোটামুটি রায়মহাশয়ের নৈত্যিক জীবনের ইতিহাস। রায় মহাশয়ের একজন আসন্ন জ্ঞাতি ছিলেন, তাঁহার পরিবারের সঙ্গে রায়মহাশয় বড় একটা সম্পর্ক স্বীকার করিতেন না কিন্তু সময়ে অসময়ে তাঁহারা তাঁহাকে মমতার চোখেই দেখিতেন। রায়মহাশয় অবসরমত কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন, আর আদায়ী খতের বাণ্ডিল গুলি দিনে এক একবার করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেন ভুলে অনাদায়ী খত যদি দুই একটা মিশিয়া গিয়া থাকে! রায়মহাশয় আদায়ী খত বা অনাদায়ী তমাদীখত কখনও হস্তচ্যুত করিতেন না। আদায়ী খত গুলি বাণ্ডিল করিয়া লম্বা ছেঁড়া দিয়া রাখিয়া দিতেন খাতক যদি সেগুলি চাহিত, তিনি ছেঁড়া খতগুলি তাহাদের দেখাইয়া বলিতেন, "বাপুহে এই দেখ লম্বা ছেঁড়া দিয়ে রেখে দিয়েছি, কিছু ভেবোনা ওই দিয়ে নালিশ করা চলবে না, আর কখনও কেউ বলতে পারবেনা যে গোবর্দ্ধন রায় টাকা পেয়ে "না" বলেছে। তবে কি জান, এইগুলি রেখে দিয়েছি, আপদে বিপদে হয়ত কাজে লাগলেও লাগতে পারে, "তৃণ হতে কার্য্য হয় রাখিলে যতনে" এই বলিয়া উৎসাহ পূর্ণ দৃষ্টিতে খাতকের চোকের দিকে তাকাইতেন। রায়

মহাশয়ের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত মিথ্যা বা প্রবঞ্চনার অভিযোগ কখনও শুনা যায় নাই সুতরাং খাতকগণও বেশি কিছু ব্যস্ত হইত না। তবে এই সকল খত কখনও রায় মহাশয়ের কোন কাজে লাগিয়াছে বলিয়া কেহ শুনে নাই ; তমাদী খত অতি সামান্যই থাকিত, রায় মহাশয়ের টাকা অনাদায়ী বড় থাকিত না, কদাচিৎ দুই একটা খত মারা যাইত। রায় মহাশয় পরম ধৈর্য্যের সহিত সেই খতগুলি লইয়া (কোনটা বা দশবৎসর কোনটা বা বিশবৎসর) প্রায় প্রত্যহ নাড়া চাড়া করিতেন। আর ঋণ পাপে নরকগামী পূর্ব্ব পুরুষের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী শুনাইয়া বর্ত্তমান ওয়ারীশগণকে দুইএক দিন পরে পরেই কেবল আসল টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেন। রায় মহাশয় কি এতই সুদ-খোর যে মৃত ব্যক্তির টাকার জন্য এতদিন পরে আবার সুদের দায়ী করিবেন ? রায়মহাশয় যে তাহাদের ঐহিক পারত্রিক কুশল চিন্তা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন এমন কথা কে বলিল ?

(৩)

নিমু ঠাকুরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলেই হোক্ আর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বশতই হোক্ গ্রামের বড় কেহ একটা জানিতে পারিল না ঠিক এমনি অবস্থায় একটী ঘোমটা পরা নূতন বউ হঠাৎ একদিন রায় মহাশয়ের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ছড়াইয়া সকলকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সকলে পরস্পর মুখের দিকে চাহিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "বুড়োটা ক্ষেপেছে নাকি ?" রায়মহাশয় কিন্তু কাহারও কোন কথায় কান দিতে রাজি হইলেন না ! বরং সেই অনুগতা বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে এক দিন বেশ পরিষ্কার কণ্ঠেই জবাব দিলেন যে মলে মাগ হাঁড়িতে নিক্ বুঝলে ? এবয়সে বেঁধে বেড়ে খাওয়া সে কি আর পোষায় ? এরপর বংশ রক্ষা চাইত ? টাকা খাবে কে ? এত কষ্টের টাকা চোক বুঁজলে পাঁচজন জ্ঞাতি এসে যে ভাগ করে নিবে সে আমি মলেও সইতে পারবনা—বুঝলে ?" বলা বাহুল্য এই কথা গুলি বৃদ্ধাকে না বলিলেও তেমন ক্ষতি হইতনা। তবে যাঁহাদের শুনাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল তাঁহারাই ইহার সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন কিনা বলা কঠিন। আগন্তুক প্রাণীটি কিন্তু এসকল কথার আভিধানিক অর্থ না বুঝিলেও ভাবার্থ টুকু সংগ্রহ করিয়া লইতে অসমর্থ হইতনা।

সেই মেয়েটী রায় মহাশয়ের সংসারনিষ্ঠার মধ্যে হৃদয়ের

খোরাক অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাইয়াও কোন একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিত না। শরৎ মেয়েটী অত্যন্ত সোজা রকমের বলিয়া পিতা মাতার অত্যধিক স্নেহরসে পুষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ এই মরুভূমির মত শুষ্ক হৃদয় বৃদ্ধের সংসার-স্পৃহার আবেষ্টনে পড়িয়া মেয়েটীর যেটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল তাহাও যেন কেমন নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছিল। মেয়েটী প্রথম প্রথম কেবলই কাঁদিত আর জনক জননীর প্রতি মনে মনে অত্যন্ত আক্রোশ করিয়া নিরুপায় অবস্থায় তাহার নিজের মনে নিজেই আঘাত করিত। আবার অনেক সময় দেখা যাইত নূতন বউকে খুসী করিবার জন্য এমন যে নীরস শুষ্কচিত্ত রায় মহাশয় তিনিও একটু যত্নচেষ্টা করিতেছেন। শরৎ নিতান্ত বালিকা নহে। তাহার বয়স বিবাহের সময়ই বারর কোঠা ছাড়াইয়াছিল। সম্প্রতি সে আরও বড় হইয়া স্বামীর ঘর কন্নার কাজ বুঝিয়া লইয়া রায়মহাশয়ের মরজি মেজাজ তামিল করিতে এবং অবসর মত মাতার জন্য ও দাদার জন্য লুকাইয়া লুকাইয়া একটু আধটু কাঁদিয়া লইতে বেশ পটু হইয়া উঠিয়াছে। শরৎ দেখিতে তেমন সুন্দরী ছিল না। মোটামুটী ভদ্র ঘরে মানান সই মেয়েরও এক কাটি নীচু ছিল বলিয়া প্রথম তাহার বিবাহ হওয়ার সুবিধা ঘটে নাই। শরতের পিতা মহাশয় একজন মতলববাজ সংসারী। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও একটী কন্যা ; আর তেমন কেহই ছিলনা। কোনরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত মাত্র। ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য একটু ফলারে গোছের

লোক। ছোট বেলা হইতেই ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রীর প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

তিনি শিষ্য ও যজমানের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ ভোজন করিতে ভালবাসিতেন। নিজের ঘরে আহার করিয়া তাঁহার বিন্দু মাত্রও তৃপ্তি হইতনা। সেই জন্যই হোক অথবা সংসারের ভার কিয়দংশ লঘু করিবার জন্যই হোক তিনি সর্ব্বদাই শিষ্যালয় ও যজমানের গৃহে কোনও শুভাশুভ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে কিনা অথবা সত্বর তেমন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কিনা সেই সন্ধানটী অতি নিপুণতার সহিত লইয়া ফিরিতেন। তাঁহার এইরূপ সন্ধানকার্য্যের সুনিশ্চিত সুযোগ হাটবাবেই বেশি রকম মিলিত। নয়ানপুরে সপ্তাহে ৪দিন হাট বসিত। ত্রিলোচন ঠাকুর প্রতি হাট বারেই বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাস্তায় বা গলিতে স্থূল শুভ্র উপবীত গুচ্ছ ঝুলাইয়া; কোমরে চাদর খানা জড়াইয়া, শিখায় একগোট প্রকাণ্ড রক্তজবা ফুল বাঁধিয়া কপালে রক্ত চন্দনের মোটা ফোঁটা কাটিয়া, ভগ্ন ছত্র ও বাঁকা হিন্তালের লাঠি হাতে করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে বাজারে আগত প্রত্যাগত যাত্রীদিগের মুখের দিকে অভিসন্ধিমূলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। কাহাকেও দেখিয়া একটু হাসিতেন, কাহাকেও দুটা কুশল প্রশ্ন করিতেন আবার কাহারও বাজারটার গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া, তাহার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন ছুড়িয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন। বলাবাহুল্য সেই ক্ষেত্রে তাঁহার অন্ততঃ দুই তিন বেলার নিমন্ত্রণের যোগাড়



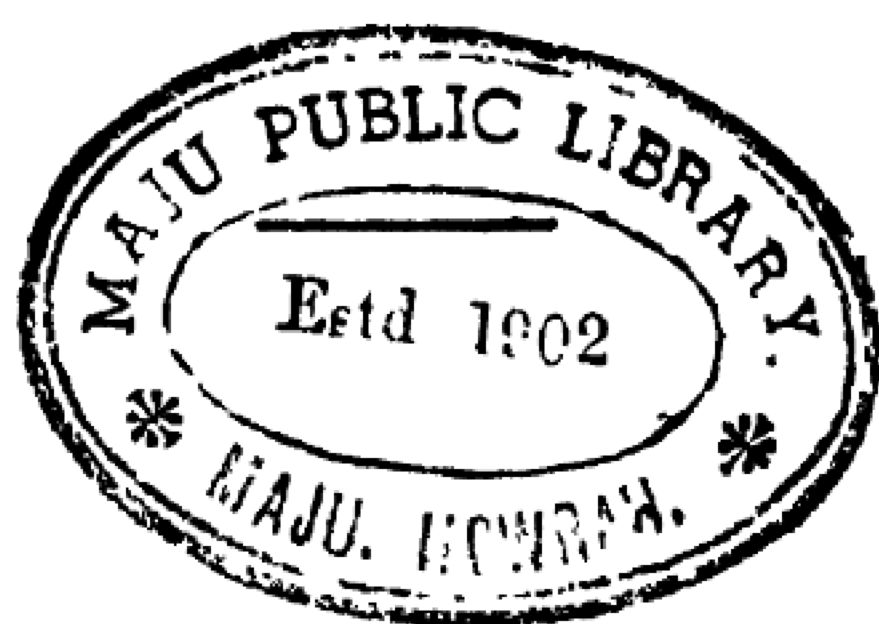
হইয়া যাইত। ইহা ছাড়া ত্রিলোচন ঠাকুরের আরও একটী বিশেষ ভাগ্য এই ছিল যে শিষ্যবাড়ী বা যজমান গৃহে একটু মোটা রকমের ক্রিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিলোচন ঠাকুরের আয়ও সেই ক্ষেত্রে নানা-দিক্ দিয়াই একটু মোটা রকমেই হইয়া যাইত। ত্রিলোচন ঠাকুর জায় ফর্দ্দ হইত আরম্ভ করিয়া হাট বাজারটাও নিজের হাতে গ্রহণ করিবার ক্লেশ অম্লানবদনে স্বীকার করিতে প্রায়ই ভুলিতেন না। এবং কর্ম্মকর্ত্তার মনস্তুষ্টির জন্য যত রকমের চেষ্টা আয়োজনের উল্লেখ খোসামুদী শাস্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে ত্রিলোচন ঠাকুর তাহাদের স্থান কাল ও অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ ব্যাপারে কদাচিৎ কিছুমাত্র অসতর্ক হইয়াছেন এমন অখ্যাতি তাঁহার অতি বড় শত্রুর মুখেও শুনা যায় নাই।

কর্ম্মকর্ত্তার সকল কার্য্য নিজ হাতে সমাপন করিয়া ত্রিলোচন ঠাকুর কিছুদিন পরে জমা খরচের ফর্দ্দ দাখিল করিতেন এবং কোনরূপ কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করিবার আগেই পৈতা গাছটী ছুঁইয়া জমা খরচে যে এক কপর্দ্দকও এদিক সেদিক হয় নাই তাহার জন্য "দিব্যি" কাটিতেন। শুনিয়া সকলেই "রাম রাম" বলিয়া তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে সমাগতপ্রায় দিব্যিরধারা স্রোত বন্ধ করিয়া দিতেন। নিকাসের সময় নাকী প্রায়ই ত্রিলোচন ঠাকুরের জমা খরচের মধ্যে প্রকাণ্ড রকমের এক একটা গলদ ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে কর্ম্মকর্ত্তার আর তাহা লইয়া বিরোধ করিবার প্রবৃত্তি থাকিত না। কাজেই ত্রিলোচন ঠাকুরকে এই শ্রেণীর ব্যাপারে

বেশ মোটা রকমেই একটা আয় দাঁড়াইয়া যাইত। তা'ছাড়া ত্রিলোচন ঠাকুরের কএক ঘর প্রজাও ছিল খামার ও ছিল—সে সকল চুষিয়া ও কতকটা তৃষ্ণা মিটিত। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে ত্রিলোচন ঠাকুরেব দারুণ ক্ষুধা মিটাইবার জন্য তাঁহার পরিবার বর্গের ক্ষুধার যেমনই হোক্ ভাল ভাল খাদ্য কদাচিৎ ঘটিলেও তাহা দ্বারা আকাঙ্ক্ষা মিটিবার সম্ভাবনা মোটেই থাকিত না। এইজন্য পরিবারে প্রায় সকলেই ত্রিলোচন ঠাকুরকে ভালর চোখে দেখিত না। এমন কি এই সকল কথা নিয়া ত্রিলোচন ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গৃহিণীর হাত মুখ নাড়াও যে না খাইতে হইত এমন নহে। কিন্তু ত্রিলোচন ঠাকুরের ধৈর্য্যের মাত্রা একটু বেশি রকমের ছিল বলিয়াই তিনি ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহের সময় কাহারও কথার কোন জবাব দিতেন না বা আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া আহার নিষ্পত্তির আগে সেই বাড়ীতে খুন জখম হইয়া গেলেও চোখ তুলিয়া চাহিতেন না। একমাত্র কন্যা শরতের বয়স যখন তের, আর দেহের পুষ্টিও যখন শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তখন গৃহিণীর চোখের নিদ্রালোপ হইয়াছিল। ত্রিলোচন ঠাকুরের 'দিয়ে থুয়ে' বিবাহ দিবার সঙ্গতি ছিলনা। মেয়েটীও সুশ্রী নহে, রংটা একুটু ময়লা, চুল কটা, নাকটা একটু চ্যাপটা, দাঁতগুলিও একটু উঁচু তা যেমনই হোক্ শরতের ডাগর ডাগর চোখ দুটী তাহাকে ইহারই মধ্যে বেশ মানাইত, তার উপর সম্প্রতি যৌবনের হাওয়া লাগিয়া তাহার

সর্ব্বদেহে একটা লাবণ্যের ঢেউ উঠিতেছে বলিয়া মনে হইত, শরতের কাজকর্ম্ম করিবার শক্তি যথেষ্ট, স্বাস্থ্যও প্রচুর। শরতের বয়সের কথা লইয়া পাড়া প্রতিবেশীদিগের মধ্যেও যখন 'কথা' উঠিবার সংবাদ গৃহিণীর কাণে পৌঁছিল—তখন গৃহিণী যথার্থই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ত্রিলোচন ঠাকুর বহু স্থানে চেষ্টা করিয়াও একটী পাত্রের সংস্থান করিতে না পারিয়া একেবারে দমিয়া পড়িলেন, যাহার সঙ্গে দেখা হয় তাহাকেই পাত্র যুটাইয়া দেওবার জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন,-সে যে কি মিনতি,-কি নির্ব্বন্ধ তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিতে পারিবেন কিনা জানিনা;—এমন যে পেটুক ফলারে ত্রিলোচন, তাঁহারও কন্যাদায়ের চাপে আহারে অরুচি জন্মিয়া গেল। ভগবানের লীলাই বল, আর নিয়তির চক্রই বল টাকার কুমীর রায়মহাশয় যেদিন পত্নীহারা হইয়া সংসার সমুদ্রে একা ভাসিয়া পড়িলেন আর তাঁহার কুল পুরোহিত নিমু ঠাকুর সেই সংবাদটা ঘোষেদের বাড়ী ফলারের মাঝখানে উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করিয়া ফেলিলেন তখন অনেক গুলি বয়স্কা কন্যার ভার-গ্রস্ত পিতৃশ্রেণী জীবের লোলুপ কর্ণ ও উৎসুক' চক্ষু নিমু ঠাকুরের দিকে সজাগ হইয়া পড়িয়াছিল। ধুরন্ধর ত্রিলোচন ঠাকুরই কিন্তু আহারান্তে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম নমস্কার জানাইয়া একটু আড়ালে লইয়া নিয়া পৈতা গাছটী দিয়া বেমালুম হাত দুখানি জড়াইয়া একেবারে বাস্প গদ্ গদ্ স্বরে নিজের অনূঢ়া কন্যা শরতের বিবাহ রায় মহাশয়ের সঙ্গেই ঘটাইয়া দিবার প্রস্তাব অনুরোধ ও নির্ব্বন্ধ

প্রকাশ করিয়া তবে নিম্বু ঠাকুরের হাত ছাড়িলেন। নিম্বু ঠাকুর ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন সত্য কিন্তু ত্রিলোচন ঠাকুর কাজের লোক, এমন মুখের কথায় নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবেনা তাই তিনি নিম্বু ঠাকুরের পিছু লইলেন। প্রায় পাঁচসাত দিন ভরপেট নিম্বু ঠাকুরের অন্ন ধ্বংস করিয়া এবং গোপনে রায়মহাশয়ের হাল চাল অবগত হইয়া ত্রিলোচন ঠাকুর শেষটায় সফলতার জয়-পতাকা মাথায় উড়াইয়া একদৌড়ে একেবারে গৃহিণীর পায়ের গোড়ায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাত্র জামাতার বয়সের হিসাবটায় ত্রিলোচন ঠাকুর একটা মারাত্মক রকমের ভুল করিয়া বাকী সকল বিষয়েই খুব বাড়াইয়া বলিয়া গৃহিণীর মনটা একটু নরম করিয়া লইলেন। দুইদিন বাদেই নয়ান পুরের লোকে দেখিল যে—একমাত্র নিম্বু ঠাকুরের মন্ত্রের জোরে ও নিজের বরাতের শোচনীয় ফেরে প্রায় চতুর্দ্দশী-শরৎ শক্রর মুখে ছাই দিয়া—টাকার কুমীর ষাট বছরেব বুড়ো' রায় মহাশয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়া বিনা আড়ম্বরে বুকভরা নৈরাশ্য ও চোখভরা-জল লইয়া দুইজন ভোজ পুরীর কাঁধে চড়িয়া স্বামীর ঘরে যাত্রা করিল।





(৪)

এই শুভ বিবাহের ফলে–ত্রিলোচন ঠাকুর পত্নী ও পুত্রের চোখের বিষ হইলেন।—অগত্যা ত্রিলোচন ঠাকুর পুত্রের তীব্র কঠোর গঞ্জনা এবং পত্নীর শঙ্কাব্যাকুল চিত্তের বেদনাজনিত অজস্র চক্ষুজল ও বিলাপধ্বনির রকমারির হাত হইতে নিজকে কতকটা মুক্ত করিবার উদ্দেশে আর ঐশ্বর্য্যশালিনী কন্যার ভবিষ্যৎ কার্য্যভাব এখন হইতেই কতকটা বুঝিয়া লইবার মতলবেও বটে, রায়মহাশয়ের বসত ভিটা-টুকুর প্রতি নিতান্ত লুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, এইবার হয়ত রায়মহাশয় তাঁহাকে একটা বিলি বন্দোবস্তের জন্য ডাকিবেন, অন্ততঃ শরৎ একবার না ডাকিয়া কিছুতেই পারিবেনা। এই চিন্তার বেগ দমন করিবার শক্তি ত্রিলোচন ঠাকুরের ছিলনা। তিনি একদিন নিজেই নিধু ঠাকুরের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নিধু ঠাকুর তেল মাখিয়া স্নানের পূর্ব্বে নিয়মিত তামাক ছিলিমের সংকার কার্য্যে নিবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ ত্রিলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন, " কি ভায়া, এতদিন পরে বুঝি এই গরীবের কথা মনে হল ?" "সেকি দাদা, তেমার ঋণ এজন্মে ভুলবার সাধ্য নেই। এখন বল বাড়ীর সব কুশলত ? জামাই বাড়ীর সব ভালত ? আমার মেয়েটা"—

নিধু ঠাকুর বাধাদিয়া বলিলেন—"সে আর বলতে হবে না ভায়া, জানইত আমি তোমাকে কতখানি খাতির করি। তাতেইত

কত চেষ্টা চরিত্র করে আমার যজমানের সঙ্গে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ করিয়েছি। মেয়ে ভালই আছে এদিক্‌কার সব মঙ্গল। তোমবা সব ভালত?"—

ত্রিলোচন ঠাকুর সংক্ষেপে মাথা নাড়িয়া নিজেই হুকাটা লইলেন এইবার নিম্ব ঠাকুর তাঁহার ছোট ছেলেটীকে তেল ও পা ধোয়ার জল দেওয়ার আদেশ করিয়া একজোড়া খড়ম দেখাইয়া বলিলেন,—"ভায়া হাত পা ধুয়ে তেল মেখে চান কর আমার ভাগ্য যে এতদিন পর আবার এলে,—তবু ভাল, দৌলতদার জামাই বাড়ী—না গিয়ে আগে যে গরীবকেই মনে পড়েছে।"

ত্রিলোচণ ঠাকুর একটু দম ধরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন "কি জান দাদা, তোমার বাড়ী আর আমার বাড়ী ত আর আলাদা বলে মনে করিনা!—তবে যে জামাই বাড়ীর কথাটা বল্‌লে সেটা অবশ্যই একটু খট্‌কার বিষয়। তাত জানই দাদা! "প্রজায়াস্তু কন্যায়াং"—কন্যার সন্তান না হলে জামাই ঘরে ভাত খেতে নেই তবে কিনা "দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি" কিছু মূল্য দিলেই চল্‌তে পারে বটে। যাক্‌ সে ব্যবস্থা তোমাকেই কর্‌তে হবে। ন'লে মেয়েটা কি মানবে?"

নিম্ব ঠাকুর একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা হবে!"

ত্রিলোচন ঠাকুর বলিলেন "দেখ দাদা শুধু তোমায় দেখেই এই মেয়েটীকে"—

নিম্ব ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন, "রাম রাম বল কি ভায়া,

:মেয়ের ভাগ্য তাই এমন ঘরে পড়েছে, যা কষ্ট একটু থাওয়া পড়ার সেও আবার কোন অভাবে পড়ে নয়।—এই টুকুই ত মজা, আর শুনেছ তোমার যে নাতি হবে? ত্নমাস বাদে আর মূল্য দিয়ে খেতে হবে না, ভাগ্য ভাগ্য” শুনিয়া ত্রিলোচনের আহ্লাদের আর সীমা রহিলনা, বিড় বিড় করিয়া কি যেন বকিতে লাগিলেন।

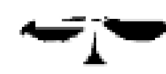
বোধ হয়—অসমীক্ষ্য বাদিনী গৃহিণীর উদ্দেশে মনের আক্রোশ ঝাড়িতে ছিলেন! আর বকাটে ছেলেটা, তাকে এখন হাতের কাছে পাইলে ত্রিলোচন ঠাকুর একবার দেখাইয়া দিতেন!

(৫ (

“বাবার পরণে কাপড় নেই দেখলুম”—শরতের কথায় বাধা দিয়া রায়মহাশয় বলিলেন—“কৈ তাঁকে ত কাপড় পরেই বসে থাক্‌তে দেখেছি?”—রায়মহাশয় একটু হাসিলেন।

“হ্যাঁগো হ্যাঁ, মানুষ আবার নেংটা থাকে কিনা, কাপড়টা যে পাঁচ সাত জায়গায় ছিঁড়ে গেছে তুমি তা দেখেছ?”

“দেখেত কিছু লাভ নেই ছোট? এই দেখ দেখি তোমার গোবর্দ্ধনের ঠেঁঠি থানা, কত দিক্ দিয়ে তালি দেওয়া; কাপড় একটা থাক্‌লেই হল। লজ্জা নিবারণ ছাড়া ত ওর কোন দরকার নেই।”



শরৎ বলিল, "লজ্জা থাক্‌লে ও দিয়ে আর বারণ হয় না. যাক্‌ খোকার মুখে ভাত দেওয়ার দিন দেখেছ?"

রায়মহাশয় একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"ঐ যা ওষধ বুঝি ধরেছে। দেখ ছোট ও সব বাজে খরচ কেন? তুমি ত বোঝ না—ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার জন্য অত দিন ক্ষণ দেখার দরকার করে না। ভাত খাবার বয়স যখন ওর হবে তখন আপনিই ভাত তুলে মুখে দেবে!"

শরৎ মুখ ভার করিয়া বলিল "হুঁ"।

রায় মহাশয় পুত্রবতী শরৎকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন, শরতের সেই জড়তা মনমরা ভাব এখন আর ততটা নাই। শরত নিজের সংসার নিজেই এখন বুঝিয়া লইতে বেশ পারিত—যদি না রায় মহাশয়ের তাহাতে কতকটা আশঙ্কা মূলক আপত্তি থাকিত। এই কথার পর রায় মহাশয় ভাবিলেন গৃহিনী জবাব না দেওয়াব জন্যই বুঝি হারিয়া গেলেন। তাই আবার উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"দেখ ছোট, পাঁচটা নয় সাতটা নয় এইত একটা ছেলে, বাঁচবে যে তার ভরসা কি? মিছামিছি এত আগে খরচ পত্র করে লাভ কি? ধর না কেন—ছেলেটা যদি বেঁচেই যায়,"—

শরৎ "ষাট্‌" বলিয়া ছোট শিশুটিকে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

এই বারেও রায়মহাশয় সুবিধা করিতে না পারিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন বলিলেন, "দেখ ছোট তুমিত সবই দেখতে পাচ্ছ

আমার আয়টাত বড় বেশি নয়, এদিকে ছেলেটার জন্যও ত কিছু রেখে যেতে হবে, আমার ঘরে এসে বড় একটা সুখ ভোগ তুমি কখনো করলেনা। এর পর আমি আর কদিন"—বলিতে বলিতে সত্য সত্যই রায় মহাশয়ের চোখে জল আসিল।

শরৎ একটু নরম হইয়া কহিল, "ছেলের খাবার জন্য এত যে ভাবছ, দেব ধর্ম্ম না করে শুধু ছেলের খাবার জোগালেই কি ছেলে বাঁচবে?"—শরৎ আর বলিতে পারিল না, অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং চোখ দিয়া দুটী ধারা দুই গাল বাহিয়া ছুটিল। এইবার রায়মহাশয় নরম হইয়া পড়িলেন। ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার দিন দেখাইবার জন্য নিস্থ ঠাকুরের বাড়ী চলিয়া গেলেন। মেয়েকে একাকী দেখিয়া ত্রিলোচন ঠাকুর অন্দরে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "জামাই বুঝি দিন দেখতে গেল?" বেশ বেটী এইত চাই তুই যে এতটা পারবি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর দেখ্ শরৎ নাতির মুখে ভাত দিবিত একলা একলা দেওয়া চলবে না। তোর মাকে আর ভাইকে কিন্তু আন্‌তে হবে। আর দেখিস তোর দেওরদের কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারবি নে। ব্যাটারা তোর হিংসেয় মরে।"

পিতার মতলবটা ঠাওর করিয়া লইতে ইদানীং শরতের বেশি বিলম্ব হইতনা। শরৎ সংযত ভাবে বলিল "দেখ আগে ভাত হয়ই কিনা।"

"কেন হবেনা? হবেনা আবার! পড়েছেন আমার মেয়ের পাল্লায়!

আবার হবেনা, তার বাপকে হতে হবে" ; এই বলিয়া ত্রিলোচন আশান্বিত নেত্রে কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন আর তখনই মুখনীচু করিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মত হইলেন। শরৎ কিছু বলিল না। মাত্র এই কথা বলিল যে "বাবা সেটা তোমার মেয়ের বাহাদুরী বলে গৌরব করবার কিছুই নয়" বলিয়া শরৎ চট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ত্রিলোচন শঙ্কিত-বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন, ঘোরকলি ; জামাই বাড়ী আসিয়া অবধি ত্রিলোচন লক্ষ্য করিতেছিলেন জামাই যেন তাঁহার আগমনটা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখেন না। এই নিয়া মাঝে মাঝে মেয়ে জামাইয়ে একটু কথাবার্ত্তা হইতেও যে না শুনিয়াছেন এমন নহে। বলা বাহুল্য সেই সকল কথার মধ্যে ত্রিলোচনের সন্তুষ্ট হইবার মত কোন কিছুই থাকিত না। বরং ত্রিলোচন নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এই সকল কথার পরেও জামাতৃ গৃহে বাস করিতেন কিনা সন্দেহ। ত্রিলোচনের মেয়ের সঙ্গে তর্ক করিয়া ইদানীং জামাই বাবাজি যদিও অনেক সময় হার মানিতে বাধ্য হইতেন, তথাপি ত্রিলোচন ঠাকুর মেয়ের নিকট বিশেষ কিছু উৎসাহ লাভ করিতে পারিতেন না। ত্রিলোচনের মেয়েটী ক্রমেই একটু শক্ত গোছের হইয়া উঠিতেছিল। নিজের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া শরৎ একটী সত্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা পাইত। সেই সত্যটা অন্যকিছু নহে, পিতার নিজের দিক্ দিয়া নীচলুব্ধতা ও মেয়ের দিকদিয়া পরম ঔদাসীন্য—এইদুয়ের সংমিশ্রণে তাহার গঠিত দাম্পত্য জীবনরূপ

একটা লোমহর্ষণ ব্যাপার! শরৎ দেখিত চারিদিকে খালি স্বার্থ ও কপটতা সংসারের সকল সুখ শান্তির দ্বারে ঠেঙ্গা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে আরও দেখিত তাহার পরম সুহৃৎ পিতৃদেব সর্ব্বদাই তাহার স্বামীর বিষয়ের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছেন। কখনো কখনো বা তামাদি খতের বাণ্ডিল গুলি গোপনে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। রায়মহাশয় ঘরে না থাকিলে এখানকার জিনিষপত্র সেখানে রাখিয়া একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছেন,—অথচ সে সকল করিবার তাহার কোন অধিকার বা প্রয়োজন ছিলনা। এই জন্য রায়মহাশয় কখনো কখনো শরৎকে একটু তিরস্কারও করিয়াছেন। তা করুন কিন্তু ইদানীং পুত্রবতী হইয়া শরৎ জীবনের ব্যর্থতার চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছে, সে তাহার বৃদ্ধ স্বামীকেই তাহার সকল সুখের মূল মনে করিয়া নিজের মধ্যেই একটা আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিতে শিখিয়াছে। শিখিবে না? মাতৃত্বেই যে রমণীর চরম পরিনিষ্ঠা! তাই শরৎ এখন নিজে সুখী হইয়া রায় মহাশয়কেও সুখী করিয়া তুলিয়াছে, রায় মহাশয় এখন আর শুষ্ক সংসারী নহেন। এখন তিনি স্ত্রী পুত্র পরিবেষ্টিত ধনী-গৃহস্থ। শরৎ তাহার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া রায়মহাশয়ের লোহা লক্কর গুলিকেও সোনা করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই বয়সের ও রুচির সম্পূর্ণ বিভিন্নতা সত্ত্বেও দম্পতীর মধ্যে একটা তৃপ্তিদায়ক নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সেই স্বর্গীয় সম্বন্ধের মূলে—তুচ্ছ ইন্দ্রিয় লালসা বা ভোগ বিলাসের চিহ্ন মাত্রও নাই—সেখানে পবিত্র

পুত্রমুখ দর্শনের আনন্দোৎসব—নিত্য নূতন নূতন রসে দম্পতীর হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিতেছে—আহা সে যে স্বর্গেরই বস্তু! আগে-কার দিনে হইলে রায়মহাশয় শ্বশুরের বিরুদ্ধে হয়ত ঠেঙ্গা লইতেন, আর এখন ?—রায় মহাশয় এখন ধনসম্পত্তির চাইতে মূল্যবান্ জিনিষ পাইয়াছেন,—তবু যাহা বলেন অভ্যাস দোষে,—কিন্তু শরৎ পিতার লজ্জাকর ব্যবহারে বড়ই মর্ম্মাহত হইতেছিল আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিল, "বাবা জামাই বাড়ী এসে এতদিন থাকাটা কি ভাল দেখায় ? একবার মাকে দেখে এলে হতো না ?"

ত্রিলোচন সপ্রতিভ ভাবে বলিয়া উঠিলেন "সেকি শরৎ নাতির মুখে ভাত দেওয়া হবে শুনে, তোর মা জননীও যে এখানেই আসবে, মার আমার কিছুই মনে থাকে না এমনি ভোলা মন" বলিয়া ত্রিলোচন ঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন।

শরৎ মাটির দিকে তাকাইয়া বলিল, "সেত এখনো একমাস পরের কথা।" "তা হোক্ মা, তারা একটু আগে না এলে, কাজকর্ম্ম কে গোছাবে বল দিখিন্ ? আমি ত তোর জ্ঞাতিদের হাতে ও সব মঙ্গল কার্য্যের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারবো না মা, আমার যে মোটে এই একটী নিধি,"—

এইবার শরৎ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—"দেখ বাবা তাঁরা আমার পর হ'লেও তোমার জামাই বা নাতির পর নয়,—তুমি এসব কথা মুখে আন্‌লে, শুন্‌তে পেলে ওদের কষ্টের একশেষ হবে।"

'তোর যেমন বুদ্ধি তেমনি কথা জ্ঞাতি আবার আপনার হয়'!



এই কথা কটা আস্তে বলিয়া ত্রিলোচন ঠাকুর 'হা হা' করিয়া অতি-উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, সহসা কঠোর আওয়াজে শরতের কোলের শিশুটী কাঁদিয়া উঠিল শরৎ হার মানিয়া চলিয়া গেল। ত্রিলোচন বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন।

(৬)

নাতির মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে শরতের মাতা ও ভ্রাতা সেই যে কবে রায় মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করিয়া একদিকে জ্ঞাতি ঘরকে ও অপর দিকে জামাতার সহিত মেয়েটীকে কারণে অকারণে দিন দিনই উত্যক্ত করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ কএক মাস গত হইতে চলিল,—শরতের মাতা ঠাকুরাণী একমুহূর্ত্তের জন্যও তাহার কোন ব্যতিক্রম করিবার বা জামাই বাড়ী ছাড়িয়া আপাততঃ নিজগৃহে যাওয়ার প্রয়োজন যে তাঁহার কিছুমাত্রও থাকিতে পারে,—তাহার ক্ষীণ আভাস টুকুও প্রকাশ করিবার মত কোনও আশাপ্রদ লক্ষণ কল্পনা করিবার সুযোগ কাহাকেও দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই॥ তিনি আসিয়াছিলেন, আছেন—ও থাকিবেন এ তিনটাই একই রকমের অবিসংবাদী সত্য।

ছেলের মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে জীবনের মধ্যে এই একবার রায় মহাশয় কিছু খরচ করিয়াছিলেন। শরতের নিতান্ত

অনুরোধে ছেলের মঙ্গলের জন্য রায় মহাশয় এবার সত্য সত্যই গ্রামের সকলকে খাওয়াইয়াছেন। কিছু সামান্য দান দক্ষিণাও করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় এবারও রায় মহাশয়ের সেই দুর্নাম কাটিল না, বরং রায় মহাশয় টাকা বাঁধিয়া রাখিতেন সেও একটা লাভ ছিল। এবার কিন্তু রায় মহাশয় টাকা বাহির করিয়া দিয়াও আশানুরূপ যশোলাভ করিতে পারেন নাই। এসম্বন্ধে যদিও 'বখিলের টাকা ভোগে লাগে না' বলিয়া রায়মহাশয়ের নূতন রকম একটা দুর্নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি ঘরের কথা যাহারা ভাল রকম জানিত তাহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল রায় মহাশয় শ্বশুর-শাশুড়ীর পাল্লায় পড়িয়া ঘরের টাকায় অপযশঃ ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন।

ছেলের মুখে ভাত দেওয়ার দুই দিন আগেই শরতের প্রবল জ্বর হইয়াছিল, শরৎ তবু বিছানায় শুইয়া শুইয়াই সকল বন্দোবস্ত করিতেছিল, শরৎ সর্ব্বদাই শঙ্কা করিতেছিল যে, ঘরে মা, বাহিরে বাবা আর মাঝখানে দাদা, এঁরা খোকার ব্যাপারটা মাটি না করিয়া ছাড়িবেন না। তাই লাগা বাড়ীর আসন্ন জ্ঞাতি দেবরের ছেলের বৌকে ডাকিয়া হাত খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "বৌমা, দেখছতো আমি জ্বরে পড়েছি, জন্মে কিছু ক'রলুমনা, খোকার' মুখে দুটি ভাত দিব, তাও বিধাতার সইল না, বিছানায় পড়েছি, কবে উঠবো জানিনে, যে রকম ভাব দেখতে পাচ্ছি—তাতে বড় হুঁস থাকবে বলে ভরসা নেই,—লক্ষ্মিটী আমার, আমাদের ব্যবহারের

কথা তুমি কখনও মনে করোনি মা, এবারো যেন তাই করো। খোকার কাজের সব ভার তোমার উপর, মা নূতন মানুষ তাতে আবার আমি জ্বরে পড়েছি, মা হয়ত আমার বিছানা ছেড়ে নড়তেই পাবে না। তুমি তাঁকে চালিয়ে নিয়ো মা—আর মা"—বৌ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন "সে সব কিছু ভেব না মা, আমি সব বুঝেছি, তোমার মেয়ে সব করে নেবে"। শরৎ আশ্বস্ত হইয়া জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল।

এদিকে বৌকে কার্য্যভার লইতে দেখিয়া শরতের মাতা এ কেবারে জ্বলিয়া গিয়াছিলেন। বৌকে জব্দ করিবার জন্য মা ও ছেলেতে মিলিয়া প্রত্যেক কাজেই গণ্ডগোল বাঁধাইতেছিলেন। তাহারই ফলে রায় মহাশয়ের ভাঁড়ারের জিনিষ কতক খরচ হইল কতক ভাঁড়ারে পঁচিল—আর বাকী ত্রিলোচন পরিবারের ত্রি গহ্বরে বিশ্রাম লাভ করিল। মা যে শরতের বিছানা ছাড়িয়া নড়িতেই পারিবেন না শুধু এই অনুমানটা ছাড়া শরতের আর সকল আশঙ্কাই সফল হইয়াছিল। শরৎ সেই কয়দিন যে কঠোর জ্বর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে তাহা নাতির মুখে ভাত দেওয়া উপলক্ষে আনীতা বা স্বয়ং আগতা শরতের মাতা একবারও অনুভব করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি ভাঁড়ার ঘর রান্না ঘর ও দেওয়া থোওয়ার জায়গা একাকী এ সমস্ত স্থানে কেবলই ছুটাছুটি করিয়া ফিরিয়াছেন; কি জানি জ্ঞাতি শত্রুর হাতে পড়িয়া তাঁহার বড় সাধের নাতির শুভ কর্ম্মটী অঙ্গহীন হইয়া যায়।

এদিকে রায় মহাশয় খুব সতর্ক লোক বলিয়া টাকার থলেটি নিজের মুঠার মধ্যেই রাখিয়া তবে অন্য কাজের বিলি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; ত্রিলোচন ঠাকুর অনেক রকমের ভদ্র অভদ্র আকার ইঙ্গিতে সেই কার্য্যভারটাও নিজের স্কন্ধে বহন করিবার সামর্থ্য ও অভিপ্রায় জানাইয়া জামাতা বাবাজিকে রুগ্ন মেয়ের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিবার বৃথা চেষ্টা পাইতে কসুর না করিলেও রায় মহাশয় তাহাতে একবিন্দু টলিলেন না। এদিকে বৌ বেচারী নিজের হাতে রাঁধিয়া দেওয়া-থোওয়া করিতেছিল, আবার চরকীর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক ফাঁকে জেষ্ঠ শাশুড়ীর বিছানার গোড়ায় আসিয়া আবশ্যক মত ঔষধ পথ্যও যোগাইতেছিল। শরৎ এক রকম বেহুঁস হইয়া থাকিত, আবার বৌএর শীতল করস্পর্শে সাময়িক চেতন্য লাভ করিয়া বৌএর মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুটি তুলিয়া ধরিয়া কি যেন একটি অপূর্ব্ব শান্তির আভাস পাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইত।

বৌকে মেয়ের ঘরে আসিতে দেখিলেই শরতের মাতা চীলের মত সেই খানে ঝাপাইয়া পড়িতেন দেখিয়া শরতের রোগশীর্ণ মুখখানী লজ্জা ও বিরক্তিতে আরও বিবর্ণ হইয়া যাইত। শরতের মা কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, তিনি গুষ্ঠিশুদ্ধ খাটিয়া মরিয়াও যে নাম যশ অর্জ্জনের বেলা প্রবল প্রতিবাদিগণের আগ্রহ দেখিয়াও সহ্য করিবার মত মায়ের পেটে জন্মান নাই, সেই কথাটাই নানা রকম কথা বার্ত্তার মধ্য দিয়া শরৎকে বিশেষত বৌকে শুনাইয়া

দেওয়ার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন যে সে সময় তাহাকে নিবৃত্ত করিবার শক্তি কাহারও থাকিত না। শরৎ শুধু নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিত। শরতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বৌটি নীরবে সকল সহ্য করিয়া যাইত। এবং কোন প্রকার অসুবিধা বা বিরক্তির ভাব শরতের সাক্ষাতে প্রকাশ করিত না। ঘরে যাইয়া শাশুড়ীর কাছেও প্রকাশ করিতে শঙ্কিত হইত।

রায় মহাশয়ের দুর্ণামই হউক আর যাইহোক বলিতে গেলে সেবারে কেবল বৌটির গুণে শরতের প্রাণ ও রায় মহাশয়ের কিঞ্চিৎ মান এই দুইই বাঁচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই অবধি শরতের পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর যে নাকিস্বরে অভিযোগ অনুযোগের ক্রন্দন-ধ্বনি কড়ি মধ্যমে সুরু হইয়াছিল আজিও তাহা সমে পৌঁছে নাই। কবে যে এই নাকিসুর থামিবে তাহা শরৎও জানিবার জন্য অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। আর রায়মহাশয়ত একেবারে মহা খাপ্পা হইয়া উঠিয়া ছিলেন।

রায় মহাশয় জীবনে কখনো এতগুলি লোকের অন্ন জোগান নাই। স্বামীও স্ত্রীতে খুব সংক্ষেপে পরিমিত আহার করিতেন। আর এখন দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী ও নবজাত পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটী শ্বশুর কুলের মূর্ত্তিমান্ রাক্ষস একেবারে স্থায়ী রকমের বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়া বসিতেছে। রায়মহাশয় ভাল খাওয়া পরা কাহাকে বলে জানিতেন না আর এই মুর্ত্তিমান্ জীব তিনটীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল মাছ সেরভরা দুধ তরি

তরকারি গুড়চিনি মেঠাই এসকল জিনিষে তাঁহার ভাণ্ডার মুহূর্ত্তের জন্য পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ও দেখিতে দেখিতে ফর্শা হইয়া যাইতেছে। রায় মহাশয়ের থামারের ধানে আগে সংসার চলিয়া যাইত, সম্বন্ধী বাবুর মোটার ভাত সহ্য হয় না বলিয়া ভাল বালামের চাল বস্তা বন্দি হইয়া ভাঁড়ারে উঠিতেছে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ধান বিক্রি হইয়া আজ সম্বন্ধী বাবুর জুতা, কাল শ্বশুর মহাশয়ের ছাতা, পরশু শরতের মাতার এক জোড়া গিন্নিপেড়ে শাড়ী এই সব আসিতেছে দেখিয়া রায়মহাশয় একেবারে ভয়ঙ্কর চটিয়া গেলেন।

রায়মহাশয় প্রথম প্রথম শ্বশুর ও সম্বন্ধী বাবুকে একটু মৌখিক ভদ্রতা এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ঘরের কাজে এইবার যে তিনি যথার্থই নিশ্চিন্ত হইলেন এই কথাটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুটী মারাত্মক অপরাধে এই তিনটী শ্বশুর কূলের সুবিধাবাদী স্বার্থপর জীব এমন ধিঙ্গি হইয়া বসিয়াছে দেখিয়া একদিন তিনি শরৎকে আস্তে আস্তে সকল কথাই বলিলেন তথনও শরৎ ভাল করিয়া সারে নাই, সে স্বামীকে চোথ ঘুরাইয়া বলিল—"শেষটায় লোক না হাসায়ে বুঝি ছাড়বে না" ? রায়মহাশয় বলিলেন,—"লোকেত এই কদিন থেকেই হাস্‌তে কসুর করছে না ছোট" ? শরৎ রায়মহাশয়কে নিজের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল ও বিশ্বস্ত বলিয়াই চিনিয়াছিল, কথাটাও যথার্থ, ইদানীং রায়মহাশয় শরৎ ছাড়া কিছু বুঝিতেন না। শরৎ একটু হাসিয়া বলিল, "বুড়ো বয়েসে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই, সে যা হয় আমি করবো"। রায়

মহাশয় আশ্বস্ত হইয়া ক্রমাগত দুই ছিলিম তামাক ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

(৭)

শরৎ সারিয়া উঠিতে না উঠিতেই হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রায় মহাশয় শয্যা গ্রহণ করিলেন, প্রথম সর্দ্দি, গাত্রবেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর দেখা দিল—পরে যথাক্রমে কাসি বুকে বেদনা, ও পেটের অসুখ আসিয়া বঙ্গের বিভীষিকা ইনফ্লুয়েঞ্জার পরাক্রান্ত শ্রেণীতে সেই জ্বরকে উন্নীত করিয়া তুলিল! ইহা দেখিয়া শরৎ ভীত হইল এবং দাদাকে ডাক্তার ডাকিতে বলিল। শরতের মাতা এখন একটু গুছাইয়া লইয়াছেন। তাঁহারও একটী স্বতন্ত্র ঘর হইয়াছে, ইহার মধ্যেই বাড়ী হইতে দুইটা বড় ট্রাঙ্ক আসিয়াছে—শরতের মাতা সেই দুইটাতে নিজেদের নিজস্ব বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া থাকেন। সরিকের বাড়ী—কে কখন শরতেরই জিনিষ পত্রের মত ছো মারিয়া গরীবের মাথায় বাড়ি দিবে সেই আশঙ্কায় শরতের মাতার নাকি দিন রাত্রি ঘুম হইতনা এবং সেইজন্যই নাকি অচিরাৎ ট্রাঙ্ক দুটী আসিয়া শয়ন-মন্দির দখল করিয়া বসিয়াছে। শরতের মাতার সম্প্রতি অবসর কিছু অল্প।

রায়মহাশয় শয্যা গ্রহণ করিয়াই একটু দমিয়া পড়িলেন; তাঁর যেন মনে হইতে লাগিল এই শ্বশুর কুলের জীবগুলি যদি অতি সত্বর তাঁহার বসতভিটা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া না যায়, তবে নাবালক পুত্রসহ অকাল বিধবা শরতের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবেনা, ইহাদিগকে রায়মহাশয় ভাল করিয়াই চিনিয়াছিলেন, এবং শরতও যে ইহাঁদের পছন্দ করেনা, সেই কথাটা বুঝিতেও রায়মহাশয়ের বেগ পাইতে হয় নাই। শরৎ ইতিমধ্যেই ইহাঁদের পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিত, হঠাৎ রায়মহাশয় কাতর হইয়া পড়ায় কেমন লজ্জা লজ্জা বোধ হইতেছিল। নিজেও এখনও বিছানা হইতে উঠে নাই, শিশু পুত্রটী লইয়া এই অবস্থায় একা সে কি করিবে? ভরসাত একমাত্র বৌ সেই বেচারীও আজকাল সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবু দুই তিনবার আসিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে পথ্য যোগাইয়া যাইতেছে।

শরতের মাতা আজকাল রান্নাঘরের দিকেই বেশি করিয়া মনোযোগ দিয়াছেন। বড় বড় রুইমাছের মাথা ও গলদা চিংড়ি রোজই আসিতেছে, তিনি রাঁধিতেছেন, আর শরতের অদূর ভবিষ্যতের শোচনীয় অবস্থা কীর্ত্তণ করিয়া চোখের জলে ভাসিয়া ভাসিয়া হজম হইবে না আশঙ্কায় শরৎ কিছু মুখে দেয় না বলিয়া স্বামী পুত্রের সহিত অগত্যা নিজেই সে সকল উদরসাৎ করিতে বাধ্য হইতেছেন। হায়রে মায়ের প্রাণ! শরৎ না খাইলে কি হয়, তবুও রোজই এগুলি যে তাঁহার সধবা মেয়ের হেঁসেলে না আসিলে অমঙ্গল

হইবে, আর যদি তাঁহার বাছা একটু মুখেই দেয় তবেইত সার্থক! হাতে তুলিয়া যথের ঘরে সপিয়া দিয়া অবধি মায়ের প্রাণ যাহা করিতেছে তাহা মা'ই জানেন আর ভাগ্য বিধাতা যিনি, তিনিই জানেন, তবু যদি শরৎ একদিন দুধে মাছে এক করিয়া দেখিয়াছে, আচ্ছা নাই বা খাইল তবু দেখুক নারী জন্ম সার্থক হোক্!

ত্রিলোচন ঠাকুর বাহির বাড়ী দখল করিয়া আছেন, খাতক আসিলে জামাতার কাহিলের আছিলায় তাগাদা করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়া কিছু কিছু হস্তগত করিতেছেন। আর দুবেলা শরৎকে ধমক দিয়া দিয়া শুনাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না যে এই দুঃসময়ে তাঁহারা না থাকিলে আর দানাপানি মুখে তুলিতে হইত না।

সম্বন্ধী বাবুটি দুই বেলা পাড়ায় আড্ডা মারেন, আর সকাল সন্ধ্যায় দুইবার রায়মহাশয়ের দ্বারে যাইয়া একটু দেখা শুনা করিয়াই মুখে পান গুঁজিয়া শিস্ দিতে দিতে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়েন। শরৎ দেখিল, স্বামীর অবস্থা দিন দিনই খারাপ হইতেছে। দাদাকে ডাক্তার আনিবার কথা বলিয়া ও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। দাদা মহাশয় তাঁহার বন্ধু শ্রেণীর একজন হোমিওপ্যাথ ছোকড়াকে পরম সমাদরে কল্ দিয়া আসিলেন গদাই লস্করী চালে চিকিৎসা চলিতে লাগিল! শরৎ একদিন বলিয়া উঠিল যে "সহর থেকে একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এসো।" শুনিয়া ত্রিলোচন ঠাকুর চটিয়া গেলেন। এত খরচ করিলে এই নাবালকের কি গতি

হইবে! দাদা চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন তাঁহার বন্ধুকে এমন করিয়া অপমান করিবার অধিকার শরতের নাই। আর মাতা মামুলী রাগিণী ধরিয়া চির অভ্যস্ত রোদনে লাগিয়া গেলেন, এমন সোনার সংসারটা তাঁহার অবুঝ মেয়েটার দোষেই মাটি হইতে চলিল এবং তাহার মেয়েটী যে ভিক্ষা করিয়াও ভাত পাইবেনা সেই অপমান ও দুঃখ মা হইয়া তিনি কোন প্রাণে সহ্য করিবেন!

শরৎ দেখিল ভারি বিপদ, ইহারা সকলেই মেয়ের জন্য আর নাতির জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন কিন্তু মেয়ের যে সারসর্ব্বস্ব অযত্নে আর অচিকিৎসায় শেষ হইতে চলিয়াছে! হায় হায় শরৎ কি করিবে?

এই কয়দিন হইল সে অন্নপথ্য করিয়াছে এখনও দুই বেলা ভাত পাইতেছেনা সন্ধ্যার সময় এখনও চোখ জ্বালা করিয়া একটু জ্বর ভাব হয়, তবু স্বামীর নিতান্ত কষ্ট হইতেছে দেখিয়া স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইহাতে একটা বিশেষ অসুবিধা এই হইল যে মাতা বা পিতা অন্য সময়ে জামাতাকে চোখ মেলিয়া না দেখিলেও শরৎকে স্বামীর ঘরে যাইতে দেখিলেই তাঁহারা দুই জনের একজন ধা করিয়া সেই ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক শরতের সেবা ও ততোধিক মিলনের দ্বারে চোখ রাঙ্গাইয়া যম দূতের মতই দাঁড়াইয়া থাকিতেন। শরৎ এ সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও বুক ফাটিয়া মরিবার পথে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিল না, এবং সেই জন্যই তাহার রোগক্ষীণ দেহ সহজেই আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রায়মহাশয় এখন আর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন না, বিছানায় শুইয়াই বাহ্যে প্রস্রাব করিয়া থাকেন, শরৎ মরিয়া মরিয়াও সে সকল কার্য্য অগত্যা লজ্জা ত্যাগ করিয়াই সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। আষাঢ় মাস, আকাশ মণ্ডল নিবিড় মেঘমালায় আচ্ছন্ন, সময় সময় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে, খাল বিল ও পুকুরে বৃষ্টির জল জমিয়া প্রায় বর্ষার মতই দাঁড়াইয়াছে। সারা দিন এইরূপ মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও মাঝে মাঝে সামান্য একটু রৌদ্র এই অভিনয় চলিয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্য্য সেদিনকার মত বিদায় লইতে যাইয়াও সারাদিনের ব্যর্থতার লজ্জায় যেন চুপি চুপিই সরিয়া পড়িলেন। বিদায়ের শেষ উপহার রক্তাভ হাসিরেখা টুকু বিলাইয়া যাইবারও যেন ভরসা পাইলেন না। ক্রমে গভীর নিশিথিনী সারা সংসার জুড়িয়া নিজের এলোকেশরাশি ছড়াইয়া দিয়া খল খল করিয়া হাসিতে লাগিল। সন্ধ্যার একটু পরেই দেখা গেল যে শরতের ছেলেটীরও ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর আসিয়াছে। বিপদ কখনও একাকী আসেনা, সেই দিন রায়মহাশয়েরও অবস্থা খারাপ হইয়া চলিয়াছে। রায়মহাশয় বার দুই বিছানাতেই বাহ্যে প্রস্রাব করিয়াছেন, শরৎ শিশুটীকে লইয়া একটু শুইয়াছিল, স্বামীর বিছানা বদলাইবার সুবিধা পায় নাই, নিজেরও জ্বর আসিয়াছে, কাজেই সেই ঘরে যাইয়া দেখিতেও পায় নাই, ঠিক এমন সময় দাদাবাবু ছোকরা হোমিওপ্যাথটীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া রোগীর ঘরের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন

এবং নাকে রুমাল গুজিলেন।—তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ ডাক্তার ওদের, মানে আমার বোনের আক্কেলটা একবার দেখ, কেমন নোংড়া করে বিছানা পত্তর রেখেছে, গন্ধে অন্ন প্রাশনের ভাত শুদ্ধ উগরে আসছে। আবার সহুরে ডাক্তার আন্‌তে হাঁকা হয়েছিল। সহুরে ডাক্তার এলে এ বাড়ীতে প্রস্রাবও করবেনা কি বল ?"

ডাক্তার মাথা নাড়িলেন, শরৎ দাদার কড়া মেজাজের ধাঁজটা শুইয়া থাকিয়াই অনুভব করিয়াছিল, সহসা ত্বরিত পদে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিয়া সেখানে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিল, "মা যে ওখানে ছিল, মা কৈ ?"—

দাদা তেমনি ধাঁজে বলিলেন, "মা কৈ তা আমি কি জানি ? আর মা কি ঐ মড়া আগ্‌লে সব সময় বসে থাক্‌বে ?—ও ঘরে কি মানুষ টিক্‌তে পারে" ? শরৎ নত হইয়া বলিল, "তোমরা যদি আমার এ বিপদ সময় না দেখবে এমন দুঃখের সময় দুঃখ স্বীকার না কররে তবে আর কে করবে বল ? তোমরা যে আমার বান্ধব"। শরৎ আশা পূর্ণ নেত্রে দাদার দিকে তাকাইল, দাদা তেমনি রুক্ষস্বরে চেঁচাইয়া উঠিলেন—"দেখ শরৎ আমরা তোরই বান্ধব, তা বলে অমন মড়া আগ্‌লে থাকবার দায় আমাদের পড়েনি, আমরা তোর বিষয়-আশয় দেখবো, কেউ যাতে দু পয়সা ঠকিয়ে না নেয় তার তদারক কর্‌ব, তোর স্বামীর সেবা যত্ন করা সেটা তোদের জ্ঞাতিদেরই দায়। ফলার মারতে আসবে তখন সব ব্যাটা,—আজ এই বর্ষার রাত্রে

মড়া অগলাতে কোন ব্যাটাকে পাওয়া যাবে না, কি বল ডাক্তার ? ডাক্না তোর দেওরের ছেলের লক্ষ্মী বৌকে, তোর দেওরের সেই ভাল ছেলেটী কোথায় আজ ? আমি ঠিক বলে রাখছি শরৎ আমরা তোরই বান্ধব, তোর স্বামীর বাহ্যে প্রস্রাব কাঁড়বার কেউ নই।”

শয্যায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া রায় মহাশয় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—

“হ্যাঁ বিধবার বান্ধব” !

দাদা তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিলেন ‘তা বৈ কি ? বিধবার বান্ধবইত, আমার বোন কাল বিধবা হলে—আপনার জ্ঞাতিগুষ্টি এসে যে লুটে পুটে খাবে সেটা আমরা কিছুতেই হতে দিচ্ছিনে। যা শরৎ বিছানাটা বদলে দেগে এই বলিয়া ডাক্তারকে লইয়া দাদা বাহির হইতেছিলেন,—শরৎ যোড় হাত করিয়া বলিল, “দোহাই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আজকের রাতটা পার করে দাও। খোকারও জ্বর করেছে, খালিই কাঁদছে, খোঁকাকে নিয়ে এ ঘরে থাক্‌তে সববাই মানা করছে !”—

দাদা এবার মুখ ভেংচাইয়া বলিলেন—“মাকে যারা অপমান করেছিল তারা আজ কোথায় ? আমি আজকে এই বৃষ্টি বাদলে মড়া আগলে বসে থাক্‌তে পারব না। তোর যা ইচ্ছে করিস্”। এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন সহসা শরৎ পদাহত ফণিনীর মত ফণা বিস্তার করিয়া নাসারন্ধ্র কাঁপাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “যথার্থই তোমরা বিধবার বান্ধব, এখনও আমার বান্ধব হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছ না, যে হেতু এখনো আমার হাতের নোয়া”—

শরৎ আর বলিতে পারিল না—রাগে কাঁপিতে লাগিল। আস্তে আস্তে ত্রিলোচন ঠাকুর অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তাইত, শরৎ রাতটাও খারাপ করেছে—বাবাজীর অবস্থাটাও ভাল বোধ হচ্ছে না,—বুঝলে ? এখন কি করা যাবে,—তোমার মা জননী যে একলা ঘরে থাকতে ভয় করেন, তাইত আমাকে সেই ঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকবার উপায় দেখছি না মা, দুর্গা দুর্গা"।

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই ঝম্ ঝম্ করিয়া আবার জল পড়িতে আরম্ভ হইল, ডাক্তার সহ দাদাবাবু অন্তর্হিত হইলেন, ত্রিলোচন ঠাকুর "যা হয় করিস্ মা, তোর মা জননী বোধ হয় ভয়ে জমে যাচ্ছেন—আমি যাই মা"—শরৎ আর কিছু ভাবিবার সময় পাইল না খোকাকে একটু মাটিতে নামাইয়া স্বামীর বিছানার চাদর ও কাপড় বদলাইতে যাইয়া দেখিল, রায়মহাশয়ের শরীরের স্থানে স্থানে ময়লা লাগিয়াছে, উনুনে গরম জলের ভাঁড় ছিল, তাহা হইতে খানিকটা গরম জল লইয়া অতি সন্তর্পণে রায় মহাশয়ের শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া বিছানার কাপড় ও চাদর বদলাইয়া মুখে একটু পথ্য দিল, খোকা সেই যে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল,—এখনও তাহার রোদনেব বিরাম হয় নাই।

শরৎ জ্বরের তাপে ও ক্রোধের নিস্ফল উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল, এতক্ষণ খোকাকে মাটী হইতে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া স্বামীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া—চোখের জলে বুক ভাসাইয়া দিল। রায়মহাশয়—আজ ঘন ঘন মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যও হইতেছে

হঠাৎ শরতের মুখের দিকে তাকাইয়া যেন কি বলিবেন এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, শরৎ তাঁহার বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িল তাহার চোখের জল এবার রায় মহাশয়ের গলার দিকে পড়িল, রায় মহাশয় ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ছি! ছোট! তুমি কেঁদনা, ভগবান্ তোমায় যত কষ্টই দিয়ে থাকুন, তাঁর একটী মাত্র আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্যে তোমাকে সার্থক করে তুলেছে! তোমার আর যত দুঃখই থাক, চেয়ে দেখ তোমার বুকে কি পরম সান্ত্বনা।" শরৎ খোকার গায়ের পুলকস্পর্শ সারা দেহে প্রাণে উপভোগ করিতে যাইয়া দেখিল—খোকার জ্বরের তাপ এখনও খুবই বেশী। শরৎ কিন্তু স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তে প্রাণ ধরিয়া এমন নির্ম্মম কথাটা তাঁহাকে শুনাইতে সাহস করিল না। শরৎ মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিল, "দীনের বান্ধব, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার খোকাকে ঘিরিয়া থাক। আমার আর কেউ রহিল না ঠাকুর"। প্রকাশ্যে কহিল—"আমি তোমার কিছুই কর্ত্তে পারলুম না, ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় একবার মুখ ফুটে বল যে ক্ষমা করলে"।

রায় মহাশয় শরতের মাথায় রোগশীর্ণ হাতখানি রাখিয়া বলিলেন "আমার ছোট!"—রায় মহাশয়ের চোখ ছাপাইয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রায়মহাশয় কোন মতে কম্পিত কণ্ঠে—বলিলেন, "সাধ্বি, তোমার কোন অপরাধ নেই, বরং বৃদ্ধ বয়সে বৈষয়িক সুবিধার জন্যই তোমাকে আমি বিবাহ করেছিলুম, আমি তোমার মধ্যে স্বর্গের সন্ধান পেয়েছিলুম বলেই,—আমার নীরস প্রাণও সরস

হয়েছিল, কিন্তু তোমায়—" শরৎ এইবার ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আজ এই বর্ষণ-মুখর অন্ধকার দুর্ভেদ্য রজনীর উলঙ্গ ক্রোড়ে নিঃসহায় রুগ্ন-পতি-পুত্র ও নিজকে সঁপিয়া দিয়াও তাহার যেন তেমন নৈরাশ্য বা বিভীষিকা বোধ হইল না। স্বামীর পার্শ্বে রুগ্ন পুত্রকে বুকে লইয়া আর স্বামীর শেষ মুহূর্ত্তের তৃপ্তি প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া শরৎ আজ সত্য সত্যই হৃদয়ে বল পাইয়া বলিয়া উঠিল—উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়তর স্বরে শরৎ বলিল,—"দোহাই তোমার, আমাকে আর অপরাধী করোনা, তোমার সেবা কর্‌তে পেয়ে আমি ইহলোকেই স্বর্গ ভোগ করেছি। আমার আক্ষেপ রইল তোমার পায় মাথা রেখে"—রায়মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন,—"থাম, ছোট! খোকাকে আমি তোমার কাছেই রেখে যাচ্ছি"—শরৎ বলিল,—"ওগো, তোমার দান আমি প্রাণ দিয়ে ঘিরে রাখবো, কিন্তু আমি তোমায় ভাল ডাক্তার দেখাতে পারলুম না, ভাল করে সেবা কর্‌তে পারলুম না,—আমার বাপ ভাইয়ের অপরাধের বোঝা আমার ঘাড়ে এমনি চেপে বসেছে যে আমি তার ভারে ও লজ্জায় যেন পাতালে ধ্বসে যাচ্ছি।—আমি কখনও ভাবিনি যে তাঁরা—" শরৎ রুদ্ধ কণ্ঠে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আর হাত জোড় করিয়া ভগবানের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা জানাইয়া কহিল "ঠাকুর, আজকের রাতটা পার কর—আমি আপশোষ মিটাইয়া ডাক্তার দেখাইব আর প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লইব শুধু আজকের রাতটা"—আস্তে আস্তে দরজার বাহির হইতে

শব্দ আসিল—"মা, দোরটা খোল"। শরৎ গলার আওয়াজে চিনিয়াছিল এটি বৌমা, দরজা খুলিয়া দিল। বৌ ঘরে ঢুকিয়া শ্বশুরের বিছানার এক পার্শ্বে বসিল। তাহার মুখ ভার, মনও চঞ্চল বলিয়া শরতের মনে হইল। এই সময় শরৎ শুনিতে পাইল ডাক্তার বাবুর আড্ডায় তাহার দাদার কর্কশ কণ্ঠ, আর তবলার চাটি, এ দু'য়ে মিশিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে।

শরৎ খোকাকে বৌয়ের কোলে দিয়া একটু সরিয়া বসিল। বৌ কহিল, "মা, তোমার মেয়েকে ডাক্‌লে না কেন? অমন রাত্রে এমন জ্বর নিয়ে তুমি একলা বসে আছ মা? আমি অনেক ক্ষণ ধরে সুযোগ খুজছিলুম কিন্তু ওঁরা যাই চলে গেলেন অমনি ভয়ানক বৃষ্টি এলো, আর বেরুতে পারলুম না; ওঃ খোকারও যে—" শরৎ বাধাদিয়া বলিল, "চুপ কর বেটি"। কিছুক্ষণ থাকিয়া শরৎ বলিল, "বৌমা, আমি কি করবো এখন? আমি যে একলা"। বৌ একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি একলা হ'তে কেন গেলে মা? তোমার ছেলেরাও যে এলো বলে—, ভগবান্ রাতটা পার করলেই হয়!" শরৎ চমকিয়া উঠিয়া বৌয়ের মুখপানে তাকাইয়া একটু বাদে বলিল, "ভাল করনি বৌমা, গিরীনের যে এবার একজামিন্।" বৌ একটু হাসিয়া বলিল "এটা কি তাঁর সব চাইতে বড় একজামিন্ নয় মা" ?—বলিতে বলিতে লজ্জা ও গৌরবে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত ও ঈষৎ অবনত হইয়া পাড়ল,—শরৎ জানিত এই মেয়েটির শিক্ষা দীক্ষা তেমন না থাকিলেও হৃদয়ে মহত্ত্ব বড় সামান্য ছিল না, শরৎ বৌয়ের নত মুখ

খানি উঠাইয়া নিজের বুকে একটু চাপিয়া ধরিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'বৌমা, আজকে আমি বেশ করে বুঝতে পারছি, ভগবান্ যখন যত বড় ভাল বস্তু দান করেন, তাকে তত বড় বিপদের মধ্যেই তিনি সেই জিনিষটির মূল্য বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। বৌমা, আমি আজ এই কঠোর বিপদের মধ্যে অনেক সম্পদ লাভ করে গেলুম, যা আমার জীবনে কখনও পাইনি!"—বৌ শরতের পা'র ধূলা লইয়া তার সিঁথির উপর ঘসিতে লাগিল। শরতের দুই গাল বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, বৌয়েরও চোখের জলে বুক ভাসিতেছিল।

বৃষ্টি একটু কমিয়া আসিলে শোবার ঘর হইতে ত্রিলোচন ঠাকুর একবার গলা ঝাড়িয়া মেয়েকে সাহস দিবার জন্ত একটা বড় রকমের হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া পাশ ফিরিলেন বোঝা গেল,—সেই সময় শরতের মাতারও একটু নাকিসুর শরতের কাণে প্রবেশ করিল, সেই রোদন গন্ধি নাকি সুরে বার দুই শরতের নাম জড়িত হইয়া রজনীর নিস্তব্ধতায় আবার মিশিয়া গেল।

রায় মহাশয়ের জীবন প্রদীপ রজনীর ক্রমাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল,—দুইটি মেয়ে মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে প্রতি-মুহূর্ত্তেই সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল।

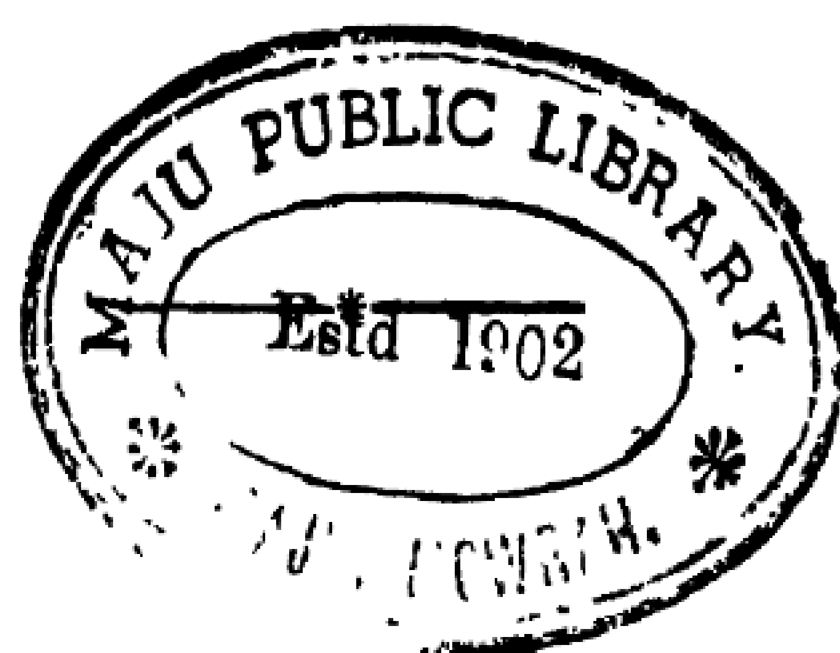
রাত্রির শেষ ভাগে খোকার অসুখটাও অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল, খোকা কিছুতেই স্বস্তি লাভ করিতে পারিতেছে না, কাসিতে কাসিতে খোকার কচি বুক খানি যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, জ্বরের

তাপও খুব বেশী, বুকে সর্দ্দি বসিয়া 'ঘড় ঘড়' শব্দ হইতেছে, একবার শরতের কোলে একবার বৌয়ের কোলে—এই মত করিয়া তাহাকেও শান্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছিল বটে, কিন্তু খোকা যন্ত্রণায় কেবলই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। শরৎ এইবার অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, তাহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল যে স্বামীর এত আদরের দান বুঝিবা তাঁহার চোখের সম্মুখেই হারাইয়া বসিবে। শরৎ একবার বাবার ঘরের দ্বারে যাইয়া বাবাকে ডাকিল। শুনিয়া 'ধড়মড়' করিয়া মাতা পিতা উভয়েই শয্যা ত্যাগ করিলেন—এখন আর শরতের সেই ক্রোধ বা অভিমান নাই, তাহার স্বামীর বুকের রক্তবিন্দুটুকুও যে আজ শরৎ হারাইতে বসিয়াছে। এই কষ্ট যে তাহার জীবনে ভুলিবার নয়। স্বামীর এই দান টুকুর জন্য সে আজ না করিতে পারে এমন কাজ নাই, না সহিতে পারে এমন দুঃখ নাই, তাই এবার সে মাতাপিতার শরণাপন্ন হইতে গেল। ত্রিলোচন দরজা খুলিয়া দিলেন তখন রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে শরৎ তাঁহার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "বাবা, খোকাও বুঝি আর বাঁচে না" ! শুনিবামাত্র শরতের মাতা হঠাৎ একটা চীৎকার করিয়া উঠিয়া, মামুলি ধরণের নাকি সুরে 'জান' করিয়া লইলেন। এবং দুই জনেই রায়মহাশয়ের গৃহে আসিয়া—দুইখানি আসন দখল করিয়া লইয়া পূর্ব্বাপর নিয়মানুসারে—একজন শুধু কথায়, আর অন্যজন মামুলি নাকি সুরে মেয়ের ভবিষ্যতের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সহসা শরতের মাতা সন্দিগ্ধ-বিস্মিত

এবং শেষে বিস্মিষ্ট নেত্রে পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন তাঁহার মেয়ের পাতানো বৌটা তাঁহার একমাত্র নাতিটীকে কোলে লইয়া বড় দরদীর মত বসিয়া আছে। শরতের মাতার আর সহ্য হইল না, খোকাকে টানিয়া লইয়া নিজের কোলে শোয়াইবার কঠোর চেষ্টা করিতে না করিতেই খোকা আবার যন্ত্রণায় 'ছট্ ফট্' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। শরতের মাতা খোকাকে কোলে লইয়া বিজয় গর্ব্বে স্ফীত হইয়া হাস্যজনক অদ্ভুত স্বরে "ঘুম পাড়ানি মাসী-পিসীর" গান জুড়িয়া দিয়া মুমূর্ষু-শিশুর যন্ত্রণাপ্রদ সান্ত্বনার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শরতের তখন সে দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না, সে দেখিতেছিল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রায় মহাশয়ের, তাহার একমাত্র আশ্রয়, পৃথিবীর দেবতা, স্বামীর জীবনআলো ম্লান-নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিয়াছে। নিভিবার আর বড় বিলম্ব নাই, শরৎ স্বামীর মুখে ঝিনুকে করিয়া একটু একটু গঙ্গাজল দিতে লাগিল, আর শঙ্কিত নেত্রে একবার বৌয়ের মুখের দিকে একবার স্বামীর চোখের দিকে তাকাইতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে শরতের চোখে এখন এক-বিন্দুও জল নাই। পাখীর কলরবে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, পূর্ব্বদিক অরুণ রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল, এইবার সূর্য্যোদয় হইবে। দিনের দুর্য্যোগ সারিয়া গিয়াছে যদি আর একটা দিন শরৎ সময় পায়, যদি আর একটা দিন, হা ঠাকুর তুমি দয়া করিয়া শুধু আর একটা দিন শরৎকে সময় দাও, শরৎ জন্মের মত আক্ষেপ মিটাইয়া সহরের ডাক্তার দ্বারা তাহার স্বামীর ও পুত্রের জীবন রক্ষা করিবার শেষচেষ্টা

পাইবে। যদি এক কপর্দ্দকও অবশিষ্ট না থাকে তাহাতেও শরতের বিন্দুমাত্রও আক্ষেপ নাই। স্বামী পুত্রের হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইবে ইহাতে একবিন্দু কপটতা নাই এক তিল বঞ্চনা নাই, তুমিত সকলই বুঝিতে পার অন্তর্য্যামি!—ভগবানের নাম লইতে যাইয়া এবার শরতের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। হুহু করিয়া অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল শরৎ সহসা দেখিল রায় মহাশয়ের চোখ কপালে উঠিয়াছে—শরৎ মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে যাইয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিতে পাইল সহরের বড় ডাক্তার লইয়া তাহার দেবরপুত্র গিরীন বিদ্যুদ্বেগে ঘরে প্রবেশ করিল, শরৎ আর নিজকে সামলাইতে পারিল না রুদ্ধ আবেগে একশ্বাসে বলিল "বাবা গিরীন্ এইবার—আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লুম—খোকাকে—বাবা—" বলিতে বলিতে শরৎ স্বামীর পায়ের গোড়ায় ধপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল, ডাক্তার দেখিলেন রায় মহাশয়ের সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বৌ চীৎকার করিয়া খোকাকে আপন কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলে শরতের মাতা তেমনি নাকি স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি আমার সোণার পুতুলকে জ্ঞাতি-শত্রুর কোলে তুলে দিতে পারবো না গো—ওগো আমার কপাল গো!"—গিরীন এইবার চীৎকার করিয়া বলিল, "ছেড়ে দাও বল্‌ছি—এখনও, বুকের চাপে ছেলেটাকে পিষে মেরে ফেলছ তাকি দেখ্‌ছ না? রায়বাবু, হা জ্যেঠা মহাশয়, একটিবার যদি—আমায় সংবাদ দিতেন!" বলিয়া গিরীন কাঁদিয়া উঠিল। ডাক্তার শিশুটীকে মাতামহীর মমতার

উৎপীড়ন হইতে কোন প্রকারে ছিনাইয়া লইয়া বৌয়ের কোলে শোয়াইয়া দিলেন এবং একটা "ইনজেকশন্" দিয়া শরতের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।



সমাপ্ত।

জামাতার জুলুম।

(১)

(জামাতার কথা)

আপনারা শুনিয়া হাসিবেন না, আমি আমার শ্বশুর যাদব বাবুর 'গৃহ-জামাতা'—অর্থাৎ গৃহপালিত প্রাণিবর্গের অন্যতম জীব। এই কথাঠা এক একবার আমার নিজের মনেও আঘাত করিয়া থাকে। অবশ্য মাঝখানে এমন কতকটা সময় গিয়াছে যখন আশা ও আনন্দে প্রাণের ভিতর নিজেই ডিগবাজি খেলিয়া চলিয়াছি, সংসারের সুখ দুঃখের হিসাব নিকাশ অতীতের খাতে তলাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের আনন্দ সমুজ্জল জীবন যাত্রার উৎসব-সঙ্গীতের কাল্পনিক মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিতেরই মত চোখ বুজিয়া কেবল সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছি,—সেই সময়ে এমন শত শত ব্যথার গভীর ক্ষতগুলিও গোলাপের কাঁটার খোঁচার মত 'অম্ল মধুর' গোছেরই মনে হইত। একদিনকার একটা ঘটনা বলি, আমার শ্বশুর যাদববাবুর সাবেক মামাশ্বশুর মহাশয় প্রায় সারাজীবন ভাগি-নেয়ীর মমতায় আবদ্ধ হইয়া জামাতা বাবাজীর বাড়ীতেই কাটাইয়া দিয়াছেন, এখনও তিনি তেমনি গৌরব ও সম্মানের সহিত এই বাড়ীর অন্নধ্বংস করিয়া যাইতেছেন। তখন আমি সবেমাত্র কয়েক মাস নিতান্ত দায়গ্রস্ত হইয়া শ্বশুর বাড়ীতে আগমন করিতে বাধ্য

হইয়াছিলাম, ছুটি কন্যারত্ন কোলে লইয়া আমার সতী সাধ্বী পরিবারও সহগামিনী হইয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয় অপুত্রক ছিলেন আমার আপন শাশুরী কয়েকমাস আগেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময় একটী ভদ্রলোক শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় অতিথি হইয়া আমার সবিশেষ খাতির যত্ন লক্ষ্য করিয়া নবীনবাবুকে (আমার শ্বশুর মহাশয়ের মামাশ্বশুর) আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, নবীনবাবু আমাকে শুনাইয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"ইনি যাদববাবুর গৃহপালিত"—আমি আর নীরব থাকিতে পারিলামনা—একলাফে নবীনবাবুর নিকটে আসিয়া তেমনি হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম "আজ্ঞে হাঁ মহাশয় এ দীন যাদববাবুর গৃহপালিত অনেকগুলি জীবের মধ্যে একটী নগণ্য জীব"—শুনিয়া নবীনবাবু এবং আগন্তুক ভদ্রলোক উচ্চহাস্যে কোঠা কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন—আমারও তখন হাসিবারই পালা ছিল, আমি প্রাণ খুলিয়া সেই হাসির তরঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিলাম। মনে যখন সুখ থাকে, প্রাণের মধ্যে যখন আনন্দের দক্ষিণা বাতাস নন্দনের পারিজাতের গন্ধ মাথায় করিয়া বহিয়া যায়, তখন যত বড় দুঃখই আসুক না কেন, 'হঠযাও' বলিয়া গলাধাক্কা দেওয়া বেশী কঠিন হয়না, গ্লানি নিন্দা বা আত্মাবমাননা নৈরাশ্যের অবস্থায় যেমন খুটিয়া খুটিয়া বাহির করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং তাহাদের এতটুকু ভারও যেমন পর্ব্বতের বোঝা বলিয়াই মনে হইয়া থাকে, আশা ও উৎসাহের মদিরামত্ত হৃদয়ে কিন্তু সে সকল গ্লানি নিন্দা বা অমর্য্যাদার

তীব্রতা মোটেই অনুভব হয় না কদাচিৎ হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না মোহের এমনি একটা ছলনা আসিয়া চোখ দুটী একেবারে রঙ্গিন রাগে রাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমার অবস্থাও তখন তাহাই ছিল। আর বর্ত্তমান? সে কথা পরে বলিতেছি—আমার অতীত জীবনের ইতিহাসটুকু আজি সংক্ষেপে আপনাদের শুনাইয়া যাইব।

পৈতৃক বাসস্থান যেখানেই থাকুক্ বর্ত্তমানে আর সে বালাই নাই। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। নাম বলিয়াই বা আর কি হইবে? শ্বশুর গৃহে পালিত বা প্রতিপালিত জীবের বাপ পিতামহের নাম ধামের সঙ্গে সঙ্গে নিজের নামটাও লোপ পাইয়াই গিয়া থাকে। সেখানে তাঁহারা 'জামাইবাবু' এই অপূর্ব্ব আখ্যায় নিজের মুখ এবং 'ইনি অমুকের জামাতা' এইরূপ পরিচয়ে শ্বশুরের মুখ উজ্জ্বল করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। আমার ভাগ্য দোষে পিতৃদেব অল্প বয়সেই আমাকে বিবাহ করাইয়া কিছুকাল পরেই ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া স্বর্গে চলিয়া যান। পরমারাধ্যা মাতৃদেবী আরও কিছুকাল আগেই সংসারের সকল পাশ কাটাইয়া বধূদর্শনের চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতৃদেব সংসারের নির্জ্জনতা এবং বৃদ্ধ বয়সের আবশ্যক সেবা যত্নের অভাব

দূর করিবার জন্য শ্বশুর মহাশয়ের একমাত্র কন্যা চিন্ময়ীর সহিত
একমাত্র মাতৃহীন সন্তান এই অভাগার সম্বন্ধ সংযোজন করিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর যাদববাবু এখানকার প্রসিদ্ধ উকিল। তাঁহার প্রতিপত্তি বা খ্যাতির যত্ন অল্প নহে। অবস্থাও তাঁহার প্রচুর। পিতৃদেব তাঁহাকে বরাবর জানিতেন, আমার বর্ত্তমান পত্নী চিন্ময়ীর রূপগুণও নাকি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; আমি শুনিয়াছি, যাদববাবু আমাদের স্বঘর, তাঁহার বর্দ্ধমানা কন্যার পাণি পীড়নের জন্য পিতৃদেবকে তিনি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, কেহ কেহ এমনও বলেন যে অপুত্রক যাদববাবুর প্রচুর ঐশ্বর্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী কন্যাই হইবেন। কন্যাদায়গ্রস্ত যাদববাবু এবং আমার স্বর্গগতা শাশুড়ী ঠাকুরাণী নাকি এইপ্রকার ইঙ্গিত প্রদান করিতেও বিমুখ হন নাই। তাঁহাদের মতে আমার এই বাল্যবিবাহ পিতৃদেবের যাদববাবুর ঐশ্বর্য্যলোভ প্রসূত বলিয়া মাঝে মাঝে শুনিয়া আসিয়াছি। সেই শুনাই আমার কাল হইয়াছে। যাক্ শ্বশুর মহাশয়ের খরচে কলিকাতা বোর্ডিংএ থাকিয়া ক্রমাগত তিন তিনবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া শেষটায় একবার বিলাত যাওয়ার জন্য রুখিয়াছিলাম। আহা, আজ যদি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিতাম!—সে কথায় লাভ নাই। শাশুড়ীর রোদনে শ্বশুর মহাশয় কিছুতেই বিলাত যাওয়ার মত করিলেন না, স্ত্রীটিত শুনিয়া কাঁদিয়াই ব্যাকুল, দেশে একটা 'হৈ, হৈ,' পড়িয়া গেল। কি করি, সে যাত্রা শ্বশুর মহাশয়ের মুখ তাকাইয়া অগত্যা

"আর, জি" করের মেডিক্যাল স্কুলে ঢুকিয়া পড়িলাম। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তখন পীড়িত, পীড়া গুরুতর। তাঁহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করাও আমার সঙ্গত বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আমার পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারটীকে শ্বশুরালয় পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিয়াছিলাম,—অনুকূল বাতাসও বহিল, শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদে পরিবারটীকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দিলাম, শ্বশুর মহাশয় সন্তুষ্ট হইলেন, শাশুড়ীত হাতে আসমান পাইলেন। আমিও কিছুকাল শাশুড়ীর সেবা যত্ন—এবং—পত্নীর প্রতি বিশেষ সতর্কতার উপদেশ প্রদান করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

স্ত্রীটি আমার নেহাৎ সোজা—তাই শাশুড়ীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগী কেবল শোকে মোহেই অধীর হইতেছিল, আর সেবা শুশ্রূষার সঙ্গে সঙ্গে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিল; নিজের স্বার্থ বা হক্‌মতলব কিছুই করিবার চেষ্টা বিন্দুমাত্রও করিলনা, হঠাৎ একদিন হার্টফেল করিয়া ভাগ্যবতী স্বর্গে চলিয়া গেলেন; আর আমার নির্ব্বুদ্ধি পরিবার জননীর স্নেহমমতার স্মৃতিটুকু লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিল—শাশুড়ীর পরিত্যক্ত গহনার যদি বাকচাবিটীও সে আদায় করিতে পারিত! স্ত্রীর উপর তখন রাগ হইয়াছিল, কিন্তু লোভ তখনও হৃদয়ে শিকড় গাড়িয়া বসে নাই; আবার স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি জন্মিয়াছিল বলিয়া নিজেই মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলাম, উদারতা ও মনুষ্যত্ব তখন ধিকার দিয়া বলিয়াছিল "পরের জিনিষে এত লোভ কেন"? আমি সঙ্কুচিত-চিত্তে শ্বশুর

গৃহে উপস্থিত হইয়া শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-শান্তি নির্ব্বাহ করিয়া আবার কলিকাতা চলিয়া গেলাম। এবার আমার শেষ পরীক্ষা। কোন মতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারের মার্কা কপালে আঁটিয়া একেবারে একটা অদ্বিতীয় গোছের হইয়া গেলাম! পরিবার তখন পিতৃ-অন্ত-প্রাণ, শ্বশুরও তখন কন্যাগত প্রাণ। আমি এইবার সুনিশ্চিত সফলতার আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। শ্বশুর মহাশয় অনুরোধ করিলেন এইবার তাঁহার বাসা বাড়ীতে থাকিয়া "প্রাক্‌টীশ" আরম্ভ করি। সহর না হইলেও টাউনটী নেহাৎ ছোট নহে, ভদ্রলোক বিস্তর। এখানে ডাক্তারী করিলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি আশা দিলেন। নবীন বাবুও আমাকে স্নেহ করিতেন, তিনিও শ্বশুরের বাসায় থাকিয়া ডাক্তারী করিবার জন্য বিশেষ 'পীড়াপীড়ি' করিতে লাগিলেন। স্ত্রীরও সেই মত। কিন্তু তখন যেন কেমন একটা শনি আসিয়া ঘাড়ে চাপিল, ভাবিলাম শ্বশুরের অনুরোধে বিলাত না গিয়াই একটা গুরুতর ভুল করিয়াছি, এখন আবার তাঁহারই অনুরোধে এই পল্লীপ্রায় টাউনে 'প্রাক্‌টীশ' আরম্ভ করিয়া জীবনটাকে মাটী করিতে পারিব না। তাঁহার নিকট হাজার পাঁচেক টাকা চাহিলাম। মেজাজটা তখনও বেশ 'চন্‌চনে' ছিল, শ্বশুরের টাকা বিনাসুদে বা অতিদানে লইয়া যাওয়া কেমন একটা লজ্জাবোধ হইতেছিল। মনের নিভৃত কোনে যাহাই থাক্ মনের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার একটা কৃত্রিম-সুর তখন খুব উঁচু করিয়া বাঁধা ছিল, তাই টাকাটা ধার চাহিয়াছিলাম। শুনিয়া শ্বশুর মহাশয়

অনেক রকম যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সংকল্প হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন বটে আমি কিন্তু তখন তাঁহার সেই উপদেশ শুনিলাম না। তাঁহার হিত উপদেশ যে টাকা না দেওয়ারই একটা প্রচ্ছন্ন ফন্দি তাহা তাঁহার মুখের উপর শুনাইয়া দিয়া সেইদিনই রাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম এবং আসিবার আগে শুনাইয়া আসিলাম আমি তাঁহার এতটুকুও ভরসা করি না। যদি পারি নিজের পায়ে দাঁড়াইতেই চেষ্টা করিব। স্ত্রীকে জানাইয়া আসিলাম 'অয়ি সমাশ্বসিহি' শীঘ্রই কলিকাতা লইয়া যাইতেছি। ধান ভাঙ্গাইয়া পাশ করি নাই, হাতে কলমে ডাক্তারী শিখিয়াছি, আমি একজন ডাক্তার!"

দেশে যাইয়া পৈতৃক বিষয়টুকু বিক্রয় করিয়া নগদ হাজার চারি-টাকা হাতে আসিলে তাহা লইয়া কলিকাতা গেলাম। চিরকাল কলিকাতায় থাকিয়া সেই জায়গার কায়দা-কানুন সমস্ত আয়ত্ত হইয়া-ছিল, তাই ছোট খাট কিছুতেই মন বসিতেছিলনা, একটা বড় রাস্তার ধারে মাসিক একশত টাকার একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া লইলাম। দুই তিনটী বন্ধুও জুটিলেন তাঁহাদের পরামর্শে ডাক্তারী ঔষধির দোকান ফাঁদিয়া বসিলাম, অনেকগুলি টাকা বাহির হইয়া গেল, কিন্তু মাসে মাসে বেশ আয় দাঁড়াইতে লাগিল। এইবার একদিন গোঁফে একটু চাড়া দিয়া শ্বশুর মহাশয়ের উদ্দেশে একটা তাচ্ছীল্যপূর্ণ ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিয়া চিন্ময়ীকে পাঠাইয়া দিতে পত্র লিখিলাম।

জামাতার জুলুম

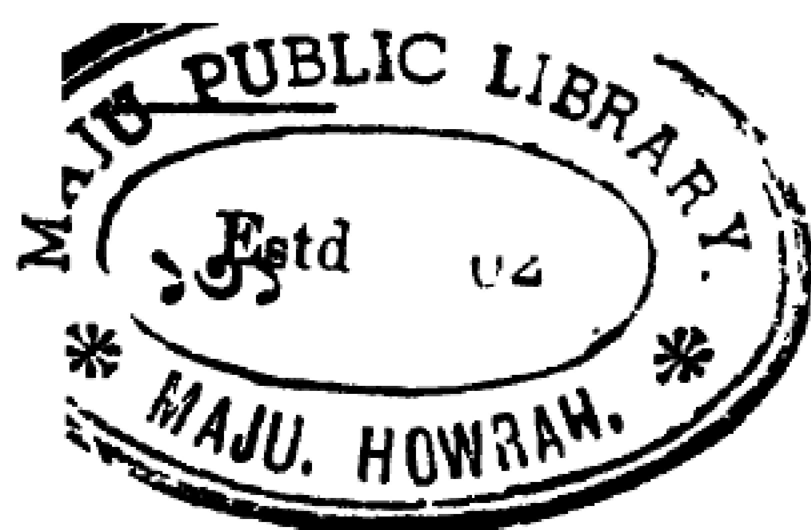
যথা কালে চিন্ময়ীদেবী একটী কন্যার জননী হইয়া আমার কলিকাতার বাসা আলো করিয়া বসিলেন! 'প্রথম কন্যা হওয়া ভাল' এই কথাটা অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম, সুতরাং মেয়েটীর নাম রাখিয়াছিলাম "লক্ষ্মী" এবং স্নেহে যত্নে তাহাকে লক্ষ্মীর মতই করিয়া তুলিয়া ছিলাম। ডাক্তারী ব্যবসায়ের একটা মজা আছে; নাম যদি একবার পড়ে তবে আর ভাবনা নাই, চারিদিক হইতে হাজার হাজার রোগী আসিয়া তাহাকে কোটীশ্বর করিয়া তুলে। আর এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়া থাকেন যে পসার বাড়াইতে হইলে অর্থাৎ নাম করিয়া তুলিতে হইলে আগে জলের মত টাকা খরচ করিতে হয়। সাজ-সরঞ্জাম, চলাফেরা এ সকল দিকে বিশেষ জাঁক জমক না হইলে নাম হওয়া কাজটা ঘটিয়া উঠে না। এই সূত্রটীর টীকা টীপ্পনী সহ ভাষ্য করিয়া বিষয়টাকে অত্যন্ত মারাত্মক করিয়া তুলিলেন আমার কলিকাতার বন্ধুত্রয়। তাঁহারা একেবারে রাতারাতি নাম জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য প্রথম মাসেই আমার আড়াই হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের পরিচিত বন্ধুমহলে আমাকে খুব বড়লোক বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, দুইবেলা তাঁহাদের একজন না একজন আমার সঙ্গে থাকিয়া কৃত্রিম 'কল্'এর ভান্ দেখাইতে কসুর করিতেন না। তাঁহাদের একজন 'কমপাউণ্ডার' ও দুইজন ঔষধবিক্রেতারূপে আমার হিতার্থে লাগিয়া গেলেন। একবৎসর গেল, ইহারই মাঝে শ্বশুর মহাশয় তিনবার আসিয়া গোসা ভাঙ্গাইবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া

গেলেন আমার রক্ত তখন ঐশ্বর্য্যের কষাঘাতে চঞ্চল এবং মস্তিষ্ক সহচরত্রয়ের কৃত্রিম গৌরবপূর্ণ স্তুতিবাদে উষ্ণ ছিল। স্ত্রীর 'কাকুতি মিনতি' অগ্রাহ্য করিয়া শ্বশুর মহাশয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বিদায় করিলাম। মুখে বড় বড় ত্যাগ ও উপেক্ষার কথা উচ্চারণ করিয়া গেলাম। শ্বশুর মহাশয় বুঝিয়া গেলেন এই জামাতাটী সহজ বাপেব বেটা নহে। সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে যথার্থই সমর্থ হইয়াছে! কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী তখন হয়ত বুঝিতেছিলেন'—না—আজ থাক।

কেন জানিনা, বন্ধুত্রয়ের চেষ্টায় আয় বাড়িয়া গেলেও অলক্ষিতে ব্যয় বাড়িয়া বাড়িয়া দ্বিতীয় বৎসরে আমার কিছু ধার হইল। বন্ধুত্রয় বুঝাইলেন উহা সামান্য মাত্র। ব্যবসায়ের দস্তরই এই। যখন টাকা আসিবে তখন মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ধরিবে না। টাকা খুব আসিল কিনা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু বছরের শেষে মা লক্ষ্মীর আর একটা সংস্করণ কন্যারূপে গৃহিণীর কোল দখল করিয়া বসিলেন। কারবার খুব জোরে চলিতে লাগিল, বাজার দর অপেক্ষা কিছু সস্তা করিয়া পসার বাড়াইবার বুদ্ধি আমার হিতৈষী বন্ধুত্রয় ইতিপূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিক্রীও বেশ হইতে লাগিল, ধারে একখানা মোটর আসিল,—বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন চারিদিকে নাকি নাম খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঔষধ-গুলিও দেখিতে পাই আসিতে আসিতেই সাবাড় হইয়া যাইতেছে। কাগজপত্র দেখিবার আমার অবসর নাই। আমার 'কল্'এর

অভাব নাই, কিন্তু বন্ধুগণের নিকট 'ফি' লওয়া অন্যায় বলিয়া সারাদিন পকেটে বেশী উঠে না। তবে নাম নাকি খুব বাড়িয়া যাইতেছে। ছোট মেয়েটীর অন্নারম্ভে বন্ধুমহলে ভোজ দেওয়ার আবশ্যকতা আমার সহকর্ম্মীরা আমাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। পসার বাড়াইবার ইহাও যে একটা রাস্তা তাহাও আমাকে সুন্দররূপে জানাইয়া দিয়া নিজেরাই চট্‌পট সকল আয়োজন করিয়া ফেলিলেন। বাজার বাছাই খাদ্যসামগ্রীতে ভাণ্ডার ভরিয়া গেল, বন্ধুত্রয়ের পরিবারগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন কেহ বিছা, কেহ বালা, কেহ অনন্ত কেহ বা গলার হার দিয়া মেয়ের মুখ দেখিলেন,—আমার পরিবার ত আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। ভোজের বেলা দেখা গেল দুইশত ভোক্তার মধ্যে আমার নিজের বন্ধু বলিয়া গুটিদশেক ভদ্রলোককে ধরা যাইতে পারে, আর যে জামা জুতাধারী ভদ্র অভদ্রশ্রেণীর লোকগুলি এত সব উপাদেয় খাদ্য হাবাতের মত গিলিয়া গেল, তাহাদের অনেকের বাড়ীতে বিনা ফিয়ে বরাবর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি, এইমাত্রই পরিচয় জানি। তবে শুনিয়াছি ইহারা আমার বন্ধুত্রয়ের আত্মীয় স্বজন। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার কন্যার পত্র পাইয়া আসিয়াছিলেন, আমার এসকল কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া তিনি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। আমার ঔষধের দোকানের খাতাপত্র দেখিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সময়ান্তরের আশ্বাসে নিরস্ত করিয়া একটু বেড়াইয়া আসিবার জন্য বন্ধু সমভিব্যাহারে

মোটরে চাপিয়া বসিলাম। হন্ হন্ করিয়া ফিরিবার মোড়ে আসিয়া মোটর খানা উল্টাইয়া যায়। তিনদিন বাদে চোখ মেলিয়া দেখিলাম চিন্ময়ীর চোখের জলে আমার অর্দ্ধেক শরীর ভিজা। দূরে শ্বশুর মহাশয় খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত। পাওনাদারগণ বাহিরের ঘরে খাতা-পত্র লইয়া হাজির। আর বন্ধুত্রয় নিরুদ্দেশ। "দুর্গা" বলিয়া পাশ ফিরিয়া সেই যে শুইয়াছিলাম, আর এই পীরগঞ্জে পৌঁছিয়া চোখ-মেলিয়া চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমার দেহ দুর্ব্বল থাকিলেও জ্ঞান ছিল, কথাবার্ত্তাও বুঝিতে পারিতাম, চিন্তাও একটু করিতে পারিতাম! সুতরাং বুঝিতে পারিতেছিলাম সতর্কতা ও ব্যবসাবুদ্ধির অভাবে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়া আজ এই নৈরাশ্যময় জীবনের দীর্ঘশ্বাসগুলি গণিয়া গণিয়া হয়রান হইতেছি। এই হয়রানির শেষ কোথায়, পরিণামই বা কি তাহা কে বলিবে? উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় বেগ নৈরাশ্যকে যখন ঠেলিয়া দিয়া আমাকে নাকে দড়ি লাগাইয়া টানিতে থাকে তখন আমি দেশকাল পাত্র সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কেবল সম্মুখের দিকেই ছুটিতে থাকি, কাঁটাবন, গর্ত্ত কোন কিছুরই দিকে তাকাইবার অবকাশ থাকে না। আমি কেবলই ছুটিতে থাকি, সংযমের শৃঙ্খলা রক্ষা করা হইয়া উঠে না, এমনি আমার চিত্তগত ভাবের বিপ্লব। জানিনা, সে কোথা কোন অচিন্তিত অবস্থায় আমাকে লইয়া যাইয়া একদিন টুঁটি টিপিয়া খুন করিয়া ফেলিবে।



(২)

(যাদব বাবুর কথা)

অনেক খানি আশায় বুক বাঁধিয়া জামাইটীকে ঘরে রাখিয়া ব্যবসা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম, সে যে কি আকাঙ্ক্ষা কি আগ্রহ স্ত্রী পুত্রহীন প্রৌঢ়ের জ্বালাময় হৃদয়ের সে যে কি তৃষ্ণা, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, তবু পারিলাম না, জামাইটী গোসা করিয়া চলিয়া গেল। একটু জুড়াইবার জন্য অন্দরে কন্যার কাছে যাইয়া দেখিলাম, সেও আমারই মত প্রাণের মধ্যে ছট্‌ফট্ করিয়া মরিতেছে, তাহার মুখ বিষণ্ণ, চোখ অশ্রুপূর্ণ, এবং কণ্ঠ গদগদ। বেশী কথা বলিবার সাহস হইল না। অপরাধীটীর মত তাহার কাছে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। মামাশ্বশুর নবীন বাবু চিন্ময়ীর অবস্থা বুঝিয়া জামাতা বাবাজীর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। বাবাজীর আগে পাছে একই কথা, "প্রাণান্তেও শ্বশুরের অন্নে পেট ভরিব না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইব" ইত্যাদি।

নবীন বাবু ফিরিয়া আসিলেন, চিন্ময়ীকে অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া একটু শান্ত করিলেন। আমার হৃদয় আগেকারই মত 'খা খা' করিতে লাগিল। একটা মেয়ে তাহাকেও সুখী করিতে পারিলাম না, হায় আমার পোড়া অদৃষ্ট! বাবাজী বাস্তুভিটাটুকু পর্য্যন্ত খোওয়াইয়া কলিকাতা যাইয়া ডিস্‌পেন্সারী খুলিলেন। আমি বরাবর সেখানকার হালচাল সন্ধান করিয়া আসিতেছিলাম,

যখন বুঝিলাম বাবাজী ঠগের হাতে পড়িয়াছেন তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, ক্রমে তিনবার কলিকাতা যাইয়া অনেক রকমে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু তখন তাহার কাছে আমার কোন কথাই ভাল লাগে নাই—ভাল না লাগিবারই কথা। মেয়েটীকেও অনেক রকম বুঝাইয়াছি, সে যখন আমার কাছে স্বামীর অদূর ভবিষ্যতের দারুণ দুর্দ্দশার কথা শুনিত, তখন এক একবার অস্থির হইয়া উঠিত। কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিত—আমার সকল প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়া স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, আমি তাহার দৃঢ়তা দেখিয়া ভাবিতাম এইবার বাবাজীকে ঠিক হইতে হইবে। কিন্তু মেয়েটীর মানসিক দুর্ব্বলতা কিছু বেশী ছিল, জামাই ঘরে আসিলে তাহাকে যত প্রকার সম্ভব বুঝাইত, রাগ করিত, দিব্যি দিত, সকল রকম চেষ্টা যত্ন করিয়া স্বামীকে সতর্ক করিত বটে কিন্তু বাবাজী যেমনি একটু ধমক দিয়া কোনদিন বা একটু আদর করিয়া ব্যবসায়ের দিন দিন উন্নতির বিবরণ অনর্গল বলিয়া যাইতেন, বন্ধুগণের হিতৈষণার বলে অচিরাৎ প্রভূত টাকার অধিকারী হইবার সম্ভাবনা প্রকাশ করিতেন, মেয়ে আমার অমনি গলিয়া যাইত, তখন স্বামীর বাক্যই সত্য বলিয়া স্থির করিয়া লইত।

যাক্ আমি কলিকাতা যাইয়া অনুসন্ধানে, জানিতে পারিলাম, বাবাজীর বন্ধুগণ ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন বটে; কিন্তু ব্যবসায়ের লাভ লোকসান তাকাইয়া দেখিবার অবসর

বাবাজীকে একটুকুও দিতেছেন না। আরও জানিলাম বাবাজীর ঔষধ প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানী হইতে আসিত এবং প্রত্যেক বারই যথেষ্ট বাকি চলিয়া আসিত, এক দোকানে এত টাকা বাকি রাখা চলেনা বলিয়া তিন চারিটী দোকান হইতে ঔষধাদি আসিত, এবং শীঘ্র শীঘ্র মাল সাবাড় করিয়া বাবাজীকে ক্রমোন্নতি দেখাইবার মৎলবে বন্ধুগণ বাজার দর অপেক্ষা দুই চারি পয়সা সস্তা দরে ঔষধগুলি বিক্রী করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে বন্ধুগণের হাতে ঘন ঘন কাঁচা টাকা পড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেকবারই যথেষ্ট রকমের নোটের মোটা বাণ্ডিল তাঁহাদের পকেটে উঠিতে লাগিল। বাবাজী একবারও তলাইয়া দেখিলেন না ঔষধগুলি এত তাড়াতাড়ি কাটিতেছে তবু দোকানে বাকী পড়িতেছে কেন?

যেদিন ছোট নাতিনীর মুখে ভাত দেওয়া হইয়াছিল, তাহার আগের দিনে মেয়ের মারফতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া কলিকাতা পৌঁছি। যাইয়া দেখিলাম, বাবাজীর অবস্থা শোচনীয়, প্রচুর আয়োজন উদ্যোগ করিয়া কতকগুলি লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বা দেবার্চ্চনের কোন বালাই দেখিলাম না; পুরোহিত ঠাকুর ভোজ্য করিতে বসিয়া বাবাজীকে বাপ পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবাজী বাবার নামটা পর্য্যন্ত বলিয়া ঢোক চিবাইতে চিবাইতে আমার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন আমি যথাশক্তি স্মৃতিশক্তির উপর জোর দিয়া নামগুলি বলিয়া দিয়াছিলাম। এইত দশা, এদিকে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ও অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া-

ছিলাম; আরও বিস্মিত হইয়াছিলাম বাবাজীর বন্ধু পরিবারের দুহাতে সোনা দানী বিতরণ দেখিয়া! বাবাজী ও মেয়ে দুজনেই আমাকে গহনাগুলি দেখাইলেন, আমিও কিছু গহনা দিয়াছিলাম, আমার গহনাগুলি জামাই মেয়ের তেমন পছন্দ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় নাই তাঁহারা বার বার বন্ধুপরিবারের মোটা সোনার গহনাগুলিরই প্রশংসা করিতেছিলেন।

সে যাহাহউক, মোটর আহত বাবাজীর জীবন সংশয় দেখিয়া তাঁহার বন্ধুগণকে খাতা পত্র দেখাইতে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাঁরা প্রথমটা বিশেষ আপত্তি তুলিয়াছিলেন, পরিশেষে নিজেই টানিয়া টানিয়া খাতা পত্র বাহির করিলাম, ঘরের খাতা পত্রগুলি একরকম গোছান ছিল তাহাতে ঋণ বা অন্যরকমের গোলমাল বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু বাবাজীর জীবন সংশয় এই সংবাদ শুনিয়া পাওনাদারগণ নিজ নিজ খাতাপত্র লইয়া হাজীর হইলে বেশ করিয়া দেখিলাম বাবাজীর হাজার পাঁচেক ঋণ, ষ্টকে যে সকল জিনিষ পত্র আছে তাহা বিক্রী করিয়া হাজার দুই টাকা হইতে পারে, এদিকে বন্ধুবর্গ আমার সঙ্গে বিনাকারণে বিরোধ করিয়া সরিয়া পড়িলেন পাওনাদারদিগকে আশ্বাস দিয়া বাবাজীর চিকিৎসার জন্য বিশেষ অর্থব্যয় ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলাম। চিকিৎসাতেও হাজার টাকা নামিয়া গেল। বাড়ী হইতে টাকা আনাইয়া মহাজনদের মিটাইয়া দিয়া বাবাজীকে লইয়া দেশে যাত্রা করিলাম, গেটের কাছে যাইয়াই দেখিলাম বাড়ীওয়ালা চোখ রাঙ্গাইয়া ছয়মাসের বাড়ীভাড়ার



জন্য রাস্তা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম কচিমুখখানি সাদা হইয়া গিয়াছে, চোখ দুটী ছলছল করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম এই দিন পনের হইয়াছে স্বামীর বন্ধুগণ অগ্রিম তিনমাসেরও ভাড়া একসঙ্গে তাহারই হাত হইতে লইয়া গিয়াছে; রসিদ নাকি বন্ধুগণ আফিসের বাক্সে রাখিয়াছিলেন। বাড়ীওয়ালা তাহার পাকা খাতা দেখাইয়া বলিল, "এই দেখুন ছয়মাস ভাড়া দেওয়া হয়নি, কর্ম্মচারীরা একবছরের টাকা আগাম দেওয়ার আশ্বাসে আমাকে প্রবোধ দিয়ে বিদায় করেছেন। এতবড় বাবু এত মস্ত কারবার—আমি কি জানি মহাশয়? আমার টাকা না দিলে আমি পুলিস ডাকব।" ছয়শত টাকা বাহির করিয়া দিয়া অজ্ঞানপ্রায় জামাতা বাবাজীকে লইয়া এই পীরগঞ্জে আসিয়াছি।

বাবাজীর এখনও বড় বড় 'বোল চাল' কমে নাই। একদিন বন্ধুপরিবারের দেওয়া সোনার গহনাগুলি 'মেকি' বলিয়া যখন সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণিত হইয়া গেল, সেইদিন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। বাবাজী এখন ভাল হইয়াছেন, হাজার দেড়েক টাকা খরচ করিয়া নিজ বাসাবাড়ীতে ডিসপেন্সারী খুলিয়া দিয়াছি! বাবাজী রোজই 'ধরা চূড়া' আঁটিয়া 'কল্'এ বাহির হইয়া যান, আবার শুষ্কমুখে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া আসেন। বাবাজী বলেন—কলিকাতার ডাক্তার পাড়াগাঁয়ে পোষায় না। তাঁহার ইচ্ছা কলিকাতা যাইয়া আরও একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখেন।

কিন্তু এই ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাওয়ার মধ্যে শ্বশুরের সঞ্চিত অর্থের উপরে যথেষ্ট অত্যাচারের আভাস নিহিত থাকিত বলিয়া আমি তাহাতে বড় বেশী কিছু বলিতাম না—অনেক সময়ে নীরবে উঠিয়া যাইতাম, অনেক সময়ে আবার বাজে কথা কহিয়া বাবাজীর কথাটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বাবাজী দিন দিনই কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন, দুটাকা ভিজিট করিলে মাসে দুইশত টাকা কামাই করিতে পারিতেন, কিন্তু অনেক প্রকার অনুরোধ সত্ত্বেও বাবাজীর কলিকাতার অভিমান ঘুচিলনা তিনি চারি টাকার কমে পা বাড়াইতেন না। ইতঃপর রোগীর সঙ্গে অত্যন্ত দাম্ভিকতা ও নির্ম্মমতাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া রোগীর শ্রদ্ধা একেবারেই কমিয়া গেল। ডাক বড় ছিল না, তবু তিনি রোজই বাহির হইতেন,—চারি টাকার স্থলে যদি কেহ গরীব বলিয়া তিনটী টাকাও পকেটে গুঁজিয়া দিত, তবে তাহা তিনি লইতেন না। রোগী বা তাহার অভিভাবকের মুখের দিকে টাকা ছুড়িয়া মারিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেন, এই-রূপ অবস্থায় বাবাজী আমার অজ্ঞাতে একটী মামলাও করিয়াছিলেন অথচ সেই গরীব ভদ্রলোকটী বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া বাবাজীকে রোজ তিনটী টাকা হিসাবে দিতেও চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মেয়ের জ্বর-বিকারে বাবাজীকে একদিন 'কল্' দিয়া পাঁচদিনের দায়ে তাঁহাকে ঠেকিতে হইয়াছিল, ভিজিটের বাবত প্রথম দিন তিনি চারিটাকাই দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিন হইতে বাবাজী বিনা 'কলেই' যাতায়াত

করিতেছিলেন, পঞ্চমদিনে যখন ষোলটাকা দাবি করিলেন, তখন সেই ভদ্রলোক ত একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন যাদব বাবুর জামাই, স্থানীয় লোক, বোধ হয় দয়া করিয়াই মেয়েটীকে দেখিতে আসিতেছেন। অন্য ডাক্তার একজন সর্ব্বদা থাকিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি কলিকাতার অভিজ্ঞ ডাক্তারকে একদিন মাত্রই পরামর্শের জন্য ডাকিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার সৎপরামর্শের বলেই হউক বা মেয়েটীর কুনিয়তির জোরেই হৌক্ পঞ্চম দিনেই সে ভবের খেলা সাঙ্গ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেল। কন্যাশোকগ্রস্ত পিতাকে তখন তখনই বিল পাঠাইয়া তাগিদ করার দরুণ বৃদ্ধ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বুঝি বা কি বলিয়াছিলেন,—বাবাজী অমনি আদালতে যাইয়া নালিস করিয়া বসিলেন, 'বারে' একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, সেই ভদ্রলোকটী আবার আমার আত্মীয়, আমি তাঁহার পকেটে ষোলটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া আপোষে মিটাইয়া দিতে বলিয়া দিলাম। সেবার গোল মিটিল বটে কিন্তু বাবাজীকে বড় কেহ ডাকিত না। এখনও বাবাজীর ডাক্তারীর অবস্থা এতাদৃশই বটে!

আমি পীরগঞ্জ বারের সিনিয়র উকিল। সরস্বতীর দয়া যেমনই থাক্ মা লক্ষ্মীর কৃপা মন্দ হয় নাই। নানাশ্রেণীর ভদ্র অভদ্র লোকের সাহচর্য্যে থাকিয়া নানা রকমের মামলা মোকদ্দমার নাড়াচাড়ার ফলে চুল পাকিবারও আগে মাথাটা পাকিয়াছিল। আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি মানুষ যখন উপযুক্ত যোগ্যতা ও

পরিশ্রমের অভাবে জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়, তখন হয় নিজে অদৃষ্টকে, না হয় দুরদৃষ্ট অভিভাবককে অনুযোগ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ অভিভাবক যেখানে সত্য সত্যই "দুরদৃষ্ট" অর্থাৎ বাংলার হাল নিয়মে কন্যার জনক, এবং জন্ম জন্মান্তরের পাপের ফলে জামাতা বাবাজীর অভিভাবকতা গ্রহণে নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বাধ্য। আমার বর্ত্তমান অবস্থার নাকি অনেকগুলি দোষ জন্মিয়াছে। একেত আমি নিজে একজন উপার্জ্জনশীল অবস্থাপন্ন শ্বশুর, ইচ্ছা করিলেই বাবাজীর সকল অভাব মিটাইতে পারি, দ্বিতীয়তঃ একমাত্র কন্যা, স্বামীসহ গৃহবাসিনী, "কন্যার স্বামী" সুতরাং তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন, তিনি "ডাক্তার" সুতরাং 'লায়েক'। এ হেন জামাইকে ঘরে রাখিয়াছি সুতরাং আমি বিনা কবলায় ক্রীত, অনুগৃহীত অন্ততঃ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতা এ পর্য্যন্ত নাকি বাক্যের জালেই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে, বাবাজীর নাকি কোন উপকারে আসে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আমার গুরুতর দোষ আমি অপুত্রক হইয়াও সম্প্রতি পুত্র কামনা প্রকাশ করিয়া একটা মারাত্মক রকমের ভুল করিয়াছি। আমার এই সকল দোষের জন্য নাকি জামাতা বাবাজীকে অনেক সময়ে ভদ্র সমাজে মাথা হেট করিতে হয়। মামা শ্বশুর নবীন বাবুকে নাকি বাবাজী একদিন এ সম্বন্ধে বেশ কড়া কড়া কিছু শুনাইয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু আমার চেষ্টা যত্নের অভাবেই নাকি বাবাজীর পসার রীতিমত জমিয়া উঠিতেছে না। আমার মত শ্বশুর থাকিতে নাকি এ হেন পাশকরা



কলিকাতার অভিজ্ঞ ডাক্তারের আবার পসার হয় না ? আমি নাকি সুদখোর 'সাইলক' তাই নিজের টাকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরি, এমন জামাই মেয়ের এতটুকু হিল্লের দিকে এক নজর তাকাই না। কথাটা শুনিয়া হাসিও পাইল দুঃখও লাগিল। ভাবিয়াছিলাম একদিন কথাটার জবাব দিই, কিন্তু থামিয়া গেলাম, চট করিয়া মনে পড়িয়া গেল আমি যে বাংলার মেয়ের বাবা !

*   *   *   *   *   *

টাকা থাকিলে মানুষের কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না ! 'সাধ' ? —ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে স্ত্রী পুত্রহীন জীবনযাত্রা কেমন একটা বেখাপ ঠেকিতেছিল। আমার হৃদয়ের স্নেহমমতার ধারাটী কন্যাভিমুখী, আবার কন্যার নিকট হইতে অনাবিল স্নেহমমতার প্রতিদান, অতি প্রচুর ভাবেই পাইয়া আসিতেছি। আমার মেয়েটী তাহার সমস্ত খানি হৃদয় দিয়া এই প্রৌঢ় পিতাটীর সেবা যত্ন করিয়া আসিতেছে। আমিও এই প্রৌঢ় বয়সে আবার জননীর অকৃত্রিম স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি সত্য, কিন্তু মেয়েটীর প্রতি স্নেহ মমতা করিবার ত আমার ঘরে কেহ নাই ! আবার সেই কথা ! আমার টাকার অভাব নাই, বাংলা দেশে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারও অভাব নাই সুতরাং ঘন ঘন শ্বশুর পদ প্রার্থী উমেদারের যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল—অনেকদিন, আজিও তাহার বিরতি হয় নাই। আমি অনেক দিন স্পষ্ট জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াও কেমন একটা মজা দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম

না। সত্যই কি তাই? কে জানে! তবে অবশ্য অনেকটা নৈরা প্রকাশ করিতে কখনো কসুর করি নাই। আমার মামাশ্বশুর নবীন বাবুর গোপন ইঙ্গিতের ফলেই হোক বা আমার স্পষ্ট জবাবের অভাবেই হোক তথা কথিত উমেদারগণ কিন্তু আমার গৃহত্যাগ করিতে ছিলেন না। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার জামাইটী যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেছিলেন সেই সংবাদও আমার বন্ধুবর্গের অবিদিত ছিল না। শুনিলাম একদিন নবীনবাবু জামাইটীকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "দাদাবাবু একটা কাজ করলে হয় না?—দিদিমণি বাবার আবার বিবাহ দেওয়ার কথা আমায় বলেছিলেন, আপাততঃ সেই কাজটা বন্ধ রাখলে ক্ষতি কি? দিদিমণির বর্ত্তমান গর্ভে যদি সুসন্তান হয় তবে আর ও সব হাঙ্গামে দরকার কি ভাই'' ?

আমি অপর কোঠা হইতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলাম বাবাজি কি বলেন? বাবাজি বিশেষ কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল 'ওর আবার সুসন্তান।' অনেক সময় দেখা যায়, কেঁচো খুড়িতে সাপ উঠিয়া থাকে, 'দরদ' লইয়া খেলা করিতে গেলেও রক্তপাত হওয়া অসম্ভব নহে, মিথ্যা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে যাইয়া ছাই চাপা সত্যের আবিষ্কার হইতেও দেখা না যায় এমন নহে। নবীনবাবু নাত জামাইয়ের সঙ্গে নাতিনীর একটা কলহ লাগাইয়া দিয়া ও একদিন একটু মজা দেখিবার মতলবে এই বেমালুম মিথ্যা অভি-যোগটী আমার মেয়ের উপর আরোপ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই,

কিন্তু তাহার ফলে বাবাজীর মানসিক অবস্থার একখানি সুস্পষ্ট চিত্র আমার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম!—যেন কিছুই শুনি নাই, কিছুই বুঝি নাই এমনি ভাব প্রকাশ করিয়া আগেকার মত চলা ফেরা করিতে লাগিলাম,—কিন্তু বুঝিতে পারিলাম নবীনবাবুর পরিহাসের ফলে চিন্ময়ীর সহিত জামাতার একটা বড় রকমের নিভৃত কলহ ঘটিয়া গিয়াছে, এবং সেই কলহের ফলে মেয়ের মুখ অতিমাত্র ম্লান,বুক বেদনাভারাক্রান্ত, এবং চক্ষু প্রায়ই প্রবহমান অশ্রুপ্রপীড়িত! নাতিনী দু'টীর আর তেমন যত্ন নাই, শিশু দুটী বাবার কোলে যাইয়াও যে শান্তিলাভ বা শান্তি দান করিতে পারিতেছিল না তাহা বেশ বুঝিতেছিলাম। আমি তাহাদের দুটীকে স্নেহভিক্ষু হৃদয়ের সমস্তখানি আকাঙ্ক্ষা দিয়া বুকের ভিতর জড়াইয়া রখিতাম।

* * *

(৩)

[চিন্ময়ীর কথা]

আমি বড় অভাগিনী। বাঙ্গালীর মেয়ে হাতের নোয়া আর সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকিতে নিজকে অভাগিনী বলিতে পারে না—বলিলে তার স্বামীর অকল্যাণ হয় ইহা আমার জানা আছে—তবু আমার বুকের চাপা পাথরটা ঠেলিয়া দিয়া কেবলই একটা হাহাকার উঠিতেছে—আমি বড় অভাগিনী! এ যে কেন—তাহা হয়ত সকলে বুঝিবেন না, হয়ত সকলে মনে করিবেন আমি পিতার সম্পদের

আশায় বঞ্চিত হইয়া নিজেকে অভাগিনী বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন আমি সেইজন্য দুঃখ করিনা, যদি পিতৃ সম্পদের আকাঙ্ক্ষা এতটুকু করিতাম তবে আজ এতদিন পরে পিতাকে 'মটুক মাথায়' বর সাজাইয়া 'সৎমা' ঘরে আনিতে সাহস করিতাম না। আমার যে কি দুঃখ তাহা হয়ত আমি নিজেই ভাল করিয়া বুঝিনা, তবু একটু বলিতে চেষ্টা করিব। আপনারা হয়ত জানেন বাঙ্গালার বিহঙ্গী কুলবধূগণ মনের শোক-দুঃখের করুণ কাহিনীটী কাহারও কাছে বলিতে না পারিলে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে। আমি বলিব।

সংসারে আমার দু'টী দুঃখ। সুখের গণনা কেউ কখনো করে কিনা জানিনা, এবং তৃপ্তির সহিত সুখভোগের কথাগুলি কেউ কখনো মনে করিয়া রাখে কিনা, মনে থাকিলেও তাহাতে একটু 'কিন্তু' না দিয়া কেউ কখনো প্রকাশ করে কিনা বলিতে পারিনা ; পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল করুণ শোক দুঃখের কাহিনী মানবের হৃদয়ের কোনে নানা রাগ রাগিণীতে গীত হইয়া প্রবেশ করিতেছে, মানবের দৈনন্দিন জীবনের একখানি ইতিহাস রচনা করিলে তাহার বার আনা দুঃখের সংবাদে ভরিয়া উঠিবে। তাই আমার দুঃখের কথাটাই শুনাইয়া যাইব! 'সুখ'? সেও যে জীবনে একেবারে অনাস্বাদিত তাহা নহে, তবে সেকথার এখানে প্রয়োজন নাই।

যাহা বলিতেছিলাম,—দুঃখ আমার দু'টী—অতুল ঐশ্বর্য্যশালী

পিতার একমাত্র কন্যা না হইয়া আমি যদি তাহার একমাত্র পুত্র হইতে পারিতাম, তবে এই প্রচুর সম্পত্তি আমারই হইত—এই বিশ্রী কল্পনা আমার মনেও কখনো আসে না যদিও হিতৈষিগণের মুখে আমার এরূপ দুরদৃষ্টের কথা অনেক বাবেই শুনিতে পাইয়াছি। যদি বা কন্যাই হইলাম তবে তেমন ধনবানের ঘরে পড়িলাম না কেন,—এইশ্রেণীর অতৃপ্তিও কাহাকে বলে জানি না। স্বামী যে রূঢ় ব্যবহার করিতেছেন সেইজন্যও আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার দুঃখ সর্ব্বাপেক্ষা এই যে এমন হিন্দুর দেশে স্বামী দেবতার পীঠভূমি বাঙ্গালার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া ও সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ স্বামীদেবতার মনঃক্লেশ দূর করিতে পারিলাম না! হায়, হায় নারীজন্মের এমন নিষ্ঠুর ব্যর্থতা আমার যে একেবারে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—স্বামীর সুখ, স্বামীর আনন্দ স্বামীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা যদি বুকের রক্তধারা দিয়াও সম্পাদন করিতে না পারিলাম তবে আর এই সীতা সাবিত্রীর দেশে জন্ম লইয়াছিলাম কেন? কিন্তু পারিলাম না, জীবন ভরিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আমাদ্বারা স্বামীদেবতার কেবল অসুখ অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুখশান্তি বুঝি এতটুকুও বাড়ে নাই।—আর দ্বিতীয় দুঃখ এই, এমন দুঃখের বোঝাটা নামাইবার জন্য বিধাতার নির্ম্মিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় মাতৃহৃদয়,—হায়, হায়, অভাগিনী আমি অকালে তাহাও হারাইয়াছি। বুকের যতবড় ব্যথাটাই হোক মার কাছে একবার খুলিয়া দেখাইলে ষোলআনা আরাম হইয়া যায়! মেয়ের দুঃখ মা যতটা বুঝে, বাবা যত স্নেহশীলই

হৌন্ না ততটা বুঝিবার তাঁহার কোন সুবিধাই থাকে না, মা যে নারীরই জাতি, জননীর প্রাণ যে স্নেহ মমতায় গড়া, করুণার ভোগবতী যে, সেখানে কেবলই উৎসের ধারায় ফুলিয়া ফুলিয়া সন্তানের হৃদয়টী ভরাইয়া উপচাইয়া দিতেছে! প্রাণের যত বড় বেদনাই থাক্ মা যে শুধু একটুখানি আঁচলের বাতাসে তাহা দূর করিয়া দেন, আমার এমন মা নাই, ও গো নাই, নাই, নাই, আর এ জীবনে এমন ধন মিলিবে না সেই আমার দুঃখ।

* * * * *

এই নিয়া ক্রমে আমার তিনটী সন্তান জন্মিয়াছে—কিন্তু সব কটিই মেয়ে! বাঙ্গালার মায়ের জাতি কি বলিবেন তাহা জানি না, কিন্তু আমার স্বামী এবং অন্যান্য সকলের মতে এই অপরাধ নাকি জননীর পক্ষে নিতান্ত অমার্জ্জনীয়। স্বামীর বড় আশার ও আকাঙ্ক্ষার নিধি আমি হতভাগিনী তাঁহার কোলে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। যদি পারিতাম তবে বাবা আজ নিরাশ চিত্তে, বিরস বদনে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতেন না, তবু কি তিনি সম্মত হইয়াছিলেন, আমি আর নবীন দাদা, জোর করিয়া না বাবাকে এইকার্য্যে সম্মত করিয়াছি। বাবার সেইদিনকার বালকের মত করুণ ক্রন্দন ধ্বনি আজিও আমার বুকে লাগিয়া রহিয়াছে। উঃ, মাগো আজ যদি তুমি বাঁচিয়া থাকিতে।

* * * *

পাপ মুখে বলিতে লজ্জা করে সকল কথা বলিব না, বলিলে অপরাধও যথেষ্ট হইবে। তবু সংক্ষেপে এ কাহিনী শেষ করিতে

হইবে। বাবার বিবাহ হওয়ার পর হইতে আমার স্বামীর যেন কেমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—শুধু তাহাই নহে, সেই পরিবর্ত্তনের ক্রমিক বিকাশ প্রত্যেক দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকলকার চাইতে আমার চোখেই ফুটিয়া উঠে বেশী, আমি স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া শুধু নীরবে চাহিয়া থাকি।

এই ভাবরাজ্যের প্রবল ঝড়ে আমার স্বামীদেবতার হৃদয়ের শান্তির উপবন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে—একটা অশান্তির জ্বালা, একটা তৃষ্ণার তাড়না, এবং একটা দুরাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনা যেন দিনদিন তাঁহাকে তাড়াইয়া ছুটাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তাঁহার বুকভরা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস যখন নিকটের বায়ুমণ্ডল উষ্ণ করিয়া তুলে তখন আমার বেদনায় বুক ভাঙ্গিয়া যায়—ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, কোন দিন বা তাঁহার নির্ব্বাক পাংশু মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে গিয়াও নিজের গলা নিজে চাপিয়া ধরি। আমার স্বামী, আমার দেবতার হৃদয়রাজ্য এমন ছারখার করিয়া দিবার জন্য সেখানে কোন্ রাক্ষসী বাস করিতেছে গা? কলিকাতা হইতে পীরগঞ্জ আসিয়া স্বামীর আমার কতকটা হাসি-খুসি ভাব দেখিয়াছিলাম, এখন ক্রমেই যেন কি এক ভয়ঙ্কর ভাব তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা 'তোলপাড়' করিতেছে। আমি দেখিয়া আসিতেছি বাবা বিবাহ করিবার পর হইতে তাঁহাকে বেশীবেশী খাতির যত্ন করিয়া আসিতেছেন, যেন বাবা আমার কতদোষে দোষী, কত অপরাধই যেন তিনি করিয়াছেন, তবু স্বামীর আমার মুখ

উঠিতেছে না। আমার প্রতি নির্য্যাতন দেখিয়া বাবা লজ্জা ও দুঃখে যেন মরিয়া যান, সে দিন বাবা আমার শিশুর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার বুকে মুখ লুকাইয়া কোঁপাইতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন 'মা আমার, তোর বুড়া বাপ্‌কে জ্বালা'বার জন্যই কি এ বৈতরণী গলায় বেঁধে দিয়েছিলি পাষাণি'? শুনিয়া লজ্জা ও দুঃখে আমার মাটীর নীচে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। হায় পিতা আমার, তুমি যদি বুঝিতে এ মাতৃহীন কন্যার কতটুকু সাধ মিটাইবার জন্য এই কঠোর আয়োজন! তুমি যদি বুঝিতে বাপের ভিটায় সল্‌তে বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা কন্যার হৃদয়ে কতখানি প্রবল!

* * * * *

আমার নূতন 'মা' টীর কথা এখনো কিছুই বলা হয় নাই। আমি তাঁহার কথা কি যে বলিব বুঝি না, 'মা যে কি তাহা বোধ হয় আমরা দুজনেই ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবু সে আমার মা। আমার বাবার বিবাহিতা স্ত্রী,—আমার বাবার বংশের জননী, সেই ত আমার মা। আমি বয়সে বড় হইলেও আমার নূতন মাকে 'মা'র মতই ভক্তি করি আবার কন্যার মতই সোহাগে আবদারে জ্বালাতন করিতে ছাড়ি না। আমার মেয়েগুলি নূতন মায়ের কণ্ঠ-লগ্ন হইয়াই আছে। এতটুকু খুঁত খুঁত নাই, বিন্দুমাত্র বিরক্তি নাই, যেন এ গুলি তাহার পেটের মেয়েরই নাড়ীছেঁড়া সন্তান। আমার এমন মাকে আমি 'আর' ভাবিতে পারি কি? মাও আমাকে একাধারে কন্যার মত ভালবাসে' আবার শাশুড়ীর মত সমীহ করিয়া

চলে। সৎমা আপন হয় কিনা জানি না, কিন্তু সৎমা যে কাহারও এমন হয় তাও বড় দেখি না। আমার নূতন মা বাবার সংসারে আসিয়া অবধি, বাবার সংসারে শৃঙ্খলা আসিয়াছে। ঝি, চাকর আবার হুসিয়ার হইয়া চলিতে শিখিয়াছে, বামনঠাকুর আবার নিয়মিত তেল, ঘি টুকু চুরি না করিয়া ডাল্‌এ তরকারীতে দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবার স্নান আহারের আগেকার নিয়মটী এত যত্নে এত চেষ্টাতেও যাহা সাবেক খাতে ফিরাইয়া আনিতে পারি নাই কি জানি কেন—আমার নূতন মার কর্ম্মশৃঙ্খলার পাকে পড়িয়া তাঁহাকেও একই নিরিখে—বাঁধা পড়িতে হইয়াছে। বাবার বাড়ীর হারানো শ্রী আবার যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। আর জামাই মেয়ের আদর ? সে যে কত প্রাণ ঢালা, কত মমতায় কত স্নেহকরুণায় সিক্ত তাহা একমুখে বলিতে পারি না তবু আমার এমনি পোড়া কপাল ! না থাক !

*　　*　　*　　*　　*

যতদিন যাইতেছে আমার ভীতি ও আনন্দ ততই বাড়িয়া চলিয়াছে, তবে আনন্দ কেন বলিব কি ? ভীতি কেন তাহা আজ বলিতে পারিব না। আমার এমনি দুরবস্থা যে এ আনন্দের বার্ত্তা-টুকু আমাকে অতি সন্তর্পনেই প্রকাশ করিতে হইবে। আমার আনন্দ, আমার নূতন মা অন্তঃসত্ত্বা, এই নবম মাস। আহা ভগবান্ তুমি এই কর যেন আমার একটী ভাই হয়। আমি ভাই কাহাকে বলে জানি না, শুনিয়াছি সংসারে ভাই বোনের মত এমন মধুর

সম্পর্ক নাকি আর নাই। আমার ছোটকাল হইতে একটী ভাইএর আকাঙ্ক্ষা সাঁরা হৃদয় জুড়িয়া আছে— কৈ তাহাত পূর্ণ হইল না। জগদীশ্বর—তুমি আমাকে ভাইএর বোন্ করিয়া আমার চিরপোষিত আশা চরিতার্থ কর প্রভো! আর আমার বাবার ভিটার প্রদীপ-শিখাটী চিরকালের জন্য উজ্জ্বল করিয়া দাও।' আমার বাবার পিতৃলোকের জলপিণ্ডের ভরসা অক্ষয় করিয়া তোল, গৃহদেবতার সেবা পূজার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হোক, অতিথি ব্রাহ্মণের, গুরু পুরোহিতের আশা ভরসার স্থলটী চির অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কর-প্রভো, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার, দোহাই তোমার!

(নূতন গৃহিণীর কথা)

নাঃ মাটি করিয়াছে! মা ও মেয়েতে একসঙ্গে সাধ খাওয়ার লজ্জা আমাকে এমনি চাপিয়া ধরিয়াছে যে আমি কাহারও দিকে তাকাইয়া কথাটা বলিতে সাহস পাই না। একি অপ্রত্যাশিত উৎপাত! 'অপ্রত্যাশিত'?—কি জানি কি!

তবু যেন আমার কেমন লাগিতেছে, মোটেই ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, এটা সুখের চাঞ্চল্য না দুঃখের কশাঘাত! ইস্, আমার আদর আর ধরে না! আমি লজ্জায় মরিয়া যাই আমার মেয়েটার দিকে যেন কাহারও তেমন করিয়া তাকাইবার অবকাশ নাই, সে যেন বড় পুরাতন। এটা তাহার চতুর্থ গর্ভ, যেন এটা কিছুই নয়, কিন্তু সংসারের যত আদর, ভালবাসা—সব যেন এই নূতন বধূটীর উপর স্তূপীকৃত হইয়া পড়িতেছে—মেয়ের জন্য কুটুম্বের সাধ আসে যদি পাঁচটা আমার জন্য আসে দশটা, এই উপহাস এই অস্বাভাবিক বৈষম্যের তাড়না আমাকে তিষ্ঠিতে দেয় না। আমি ভাবিয়া পাই না আমি এমন কি করিয়াছি, আমাকে এতখানি ভালবাসা এতখানি আদর যত্ন দিয়া আমার মাতৃহীন মেয়েটীর চোখের সামনে আমাকে এমনতর অপদস্থ করিয়া সকলে সুখী হইবে কেন? আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই আমার নিজের আদর সোহাগ দেখিয়া আমি নিজে যত ম্রিয়মাণ হই না কেন আমার মেয়েটীর তাহাতে কত যে আনন্দ বাড়ে তাহা আর কি বলিব। আমার

মেয়ের আনন্দ তাহার নাকে মুখে চোখে, তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক কথার—প্রত্যেক চেষ্টার মধ্যে কি উজ্জল ভাবে ফুটিয়া উঠে ;—এমন মেয়ে পেটে ধরে ছিলে দিদি ! কিন্তু তাহার গৌরব-টুকু ভোগ কর্‌বার অধিকার তোমার সতীনকে দিয়ে গেলে কোন প্রাণে ?—

*　　*　　*　　*　　*

সাধারণতঃ দ্বিতীয় পক্ষের আগমনটা পরিবারের নিকট একটা প্রবল আশঙ্কার হেতু হইতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু আমার বড়াত জোড়ে সে সকল বালাই ঘটে নাই। তবে আমার একটা আপশোষ সর্ব্বদাই থাকিয়া যাইতেছে যে জামাইটীকে যেন আমি খুসী করিতে পারিতেছি না। বাবাজীর অনিশ্চিত উৎকট আকাঙ্ক্ষা আমার সকল প্রকার সেবা যত্নের আদর আপ্যায়নের—এমন কি ছোট খাট মান দক্ষিণারও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। কেন এমন হয় জানিনা। আমার মেয়েটীকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম। সে আমার বুকে তাহার সরলতাময় মুখখানি লুকাইয়া যে কি কান্নাই কাঁদিল। আমি আর কোনদিন সেই কথা মুখে আনিতে সাহস করিলাম না। আমার মেয়ের প্রতি জামাইয়ের যে কি আক্রোশ, কি ঘৃণা, কি উপেক্ষা ও বিরক্তির ভাব দিনরাত্রি একের পর আর আসিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া গর্জ্জাইয়া যাইতেছে ইহার কারণ যাহাই হৌক্ এই অমানুষিক অত্যাচারটা যে অন্ততঃ আমার পক্ষে নেহাৎ অসহনীয় হইয়া

•

উঠিতেছে সেই সংবাদ একমাত্র আমার মেয়েই জানে। আর আমার উকীল বাবু? তাঁহার কথা পরে বলিতেছি।

'দ্বিতীয় পক্ষ' ভয়ঙ্কর কি 'দোজবর' ভয়ঙ্কর এই নিয়া যদি কখনো তর্ক উঠে তবে সেই তর্কে দ্বিতীয় পক্ষই যে পুরুষের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এবং যথার্থ বিচারে যে অবস্থাটা তদ্রূপ দাঁড়াইবে তাহাও সত্য। তবু অনেক সময়ে মনে হয় দ্বিতীয় পক্ষ যদি একটু কড়া হয় তবে দোজবরকে অনেকটা সামলাইয়া লইতে পারে। আমার বিবেচনায় দাম্পত্যরাজ্যে বৃদ্ধ বিশেষতঃ দোজবর নিজের বুদ্ধির দোষে যত বিপ্লব উপস্থিত করে। অভিভাবক অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষ যদি তখন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করে তবে সেই বিপ্লবের পরিণামফল সমস্ত পরিবারে ব্যাপ্ত হইয়া পরিবারটী ধ্বংস করিয়া তবে ছাড়ে। ইহার প্রমাণ চক্ষুষ্মানের নিকট ঘরে ঘরে পরিদৃষ্ট হইবে। আমি মনে করি দোজবরকে কখন বিশ্বাস করিতে নাই। তাহার কারণ, ইহারা ভালবাসে, ভয় করে, ভক্তিও করে। ইহারা ভাবে বয়সের বৈষম্যে স্বামী স্ত্রীর মানসিক যথার্থ সংমিলন সেখানে সম্ভবপর নহে —সেখানে প্রথম প্রথমই দ্বিতীয় পক্ষকে নানাপ্রকার লোভ ভোগ ও কৃত্রিম আদর সোহাগ দ্বারা বশীভূত করিতে হইবে। আর সেই লোভের ভোগের আদর যত্নের এত ছড়া ছড়ি ঘটাইয়া তুলে যে—দ্বিতীয় পক্ষ তখন অনেকস্থলেই যথার্থ স্নেহ মমতার স্নিগ্ধরসে সিক্ত না হইয়া তীব্র লালসার মদিরা পান করিয়া আত্মহারা হইতে বাধ্য

হইয়া থাকে। তাহার ফলে ইঁহারা পরিণত বয়সের স্বামীর‍ং; সত্যিকার স্বামিনী বা অবিভাবক হইয়া বসেন। সংসারের দস্তুর এই যে মনে যথার্থ সাহস বা বল না থাকিলে, সেই ভগ্নদুর্ব্বল মন লইয়া যাহার সহিত কারবার করনা কেন,—চোখ থাকিলে তাহা ধরা না পড়িয়া যায়না। আমাদের দোজবর স্বামী শ্রেণীর মহাত্মা-দিগেরও কিন্তু এই দুর্ব্বলতাটুকু আমাদের কাছে অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। আমি ভাবিয়া পাইনা ইহারা এত বিদ্বান্—তবু কত মূর্খ! নারীর সঙ্গে হৃদয় লইয়া লুকোচুরি।

আমার স্বামী দোজবর হইলেও তিনি উকিল, সুতরাং বজ্জাতিটুকু বিলক্ষণ আছে। তথাপি বয়সের বা অবস্থার দোষই বলিতে হইবে, প্রথম প্রথমটা কিছু বাড়াবাড়ি করিতেন। একদিন কিন্তু বেশ শাসন করিয়া দিয়াছিলাম মনে পড়ে। আপনারা আমার ধৃষ্টত্ব দেখিয়া বোধ হয় বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু আপনারা জানেন কিনা বলিতে পারিনা, আমি ছোট বেলা হইতেই কিছু মুখরা, বিশেষতঃ বর্ত্তমানে একজন নামজাদা উকিলের দ্বিতীয় পক্ষ। বলিতে কি স্ত্রীলোকের ঘরকন্নারই সাধুভাষা হইতেছে 'শাসন'। ইহার টীকা অনাবশ্যক,—সন্দেহ থাকিলে নিজ নিজ পরিবারের 'ঘরকন্না' সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখিবেন। শাসন করিবার অন্য কারণও ছিল,—আমার মনে হয় সতীন, যিনি হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদূর লইয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয়পক্ষ তাঁহারই প্রতিনিধি। স্বামী যদি সেই দ্বিতীয়পক্ষকে একটা নূতন জিনিষ বলিয়া

তাহার আদর গৌরবটা কিছু বাড়াইয়া তুলেন তবে সেই আদর বস্তুটা যথার্থ স্ত্রীর প্রাপ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। উহাদ্বারা আমার মত দ্বিতীয়পক্ষের তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না। আমি মনে করি আমি আমার দিদিরই ছায়ামাত্র। আমি নিজকে দিদির বয়স, দিদির গাম্ভীর্য্য, দিদির স্নেহমমতা ও দিদির গৃহকার্য্য দক্ষতার আবরণে আবৃত করিয়া স্বামীর সংসারে দিদির অবশিষ্ট কাজটুকু গুছাইয়া যাইব। স্বামী যদি তাঁহার চল্লিশ বৎসরকে চব্বিশে নামাইয়া ষোলর পায়ে ঢালিয়া দিতে চাহেন—এমন অবিচার সহিব কেন? বরং আমরাই আমাদের ষোলকে চল্লিশের পায়ের গোড়ায় উঠাইয়া লইব। ষোল বছরে যদি চল্লিশের গাম্ভীর্য্য, চল্লিশের জ্ঞানগরিমা অর্জ্জন করিতে পারি তবে আর দুঃখ কিসের?

আমার এই ষোল বছর লইয়া যদি বিশ বছরের মেয়ের মায়ের আসন দখল করিয়া লইতে পারিলাম, আমার দিদির ত্রিশ বছরের জ্ঞান গরিমা লইয়া নিজের সংসার আয়ত্ত করিতে পারিলাম, দিদির স্নেহের দুলাল বুকের রক্ত সন্তান সন্ততির মাতৃস্থান দখল করিয়া বসিতে পারিলাম—তবু আমাদের দুঃখ? আমাদের কিসের অভাব, কিসের দুঃখ দূর করিবার জন্য পক্ককেশ শুভ্র চল্লিশ বৎসরের পাকা মাথাটা চব্বিশের দুয়ারে কুটিয়া মরিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছ স্বামি! ছিঃ তোমাদের লজ্জা করে না? শাসনের আরও একটা কারণ ছিল—আমি মনে করিতাম শ্বশুরের বাড়াবাড়ি দেখিয়া বুঝিবা জামাইটী লজ্জা ও ক্রোধে এমন বীভৎস রকমের হইয়া

উঠিয়াছে। একদিন কথাটা স্বামীকে বলিলাম তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "এইখানেই হেরে গেছ গিন্নি!"

আমি বলিলাম "কেন?"

তিনি। "কেন?—জামাইকে তা হ'লে আজও তুমি চিন্তে পার নি?"

আমি। কি রকম? জামাইত তোমার স্ত্রৈণতার প্রশংসা করেন প্রায়ই শুনি।

তিনি। সে একটা কথার কথা, মুল কথাটা হচ্ছে 'বিষয়'।

আমি। বিষয়? কেন তার কিসের অভাব?

তিনি। অভাব এখন নেই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে হবে এমন আশঙ্কার কারণ হয়েছে! আজ যদি আমি বিষয়টা বাবাজীকে বা মেয়েকে লিখে দিই, তবে তোমায় মাথায় করে নাচ্‌লেও বাবাজী আমার নিন্দা কর্‌বেন না, বরং নাচ্‌টা জমাবার জন্য পেছন থেকে খোলে 'চাটি' লাগাবেন।

আমি। তাই নাকি? বেশ ত বিষয়টা মেয়েকে দিয়ে দাওনা।

তিনি। তা হ'লে আমাদের ভবিষ্যৎটা একবার ভাব্‌তে হয়।

আমি। আমাদের—অভাবে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "সে হয়না গিন্নি—বাবাজীর এতটা তর সইছে না।

আমি। ওঃ! আমার জন্য ভাব্‌ছ? তোমার ভ্রম! মনে

কর দিদি যদি বেঁচে থাক্‌তেন তবে তিনি কি করতেন? আমি যে আমার স্বর্গগতা দিদিরই ছায়ামাত্র, ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমাকে অপরাধিনী করো না।

তিনি অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া কহিলেন, "শোন গিন্নি, তোমার দিদি যদি বেঁচে থাক্‌তেন, এমন অকাল কুষ্মাণ্ড জামাতাকে এক কপর্দ্দকও দিতেন না। সে কথায় কাজ নেই, আমি স্থির করেছি, যদি এইবার একটী নাতি হয়, তবে চারি আনা বিষয় মেয়ের নামে লিখে দেব।

আমি। নাগো না, আরো কিছু দিতে হ'বে। আমার মেয়েকে আমিও কিছু দেব বলে রাখ্‌ছি।

তিনি। তোমার কি আছে যে দেবে?

"আমার কি নেই যে দেবনা, এমন লায়েক সোয়ামী সেও আমার মুঠোর ভেতর!" শুনিয়া স্বামী হার মানিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, এবার আমার মেয়ে জামাইকে আমি সুখী না করিয়া ছাড়িব না। দিদির বড় অন্যায় তিনি আমার মেয়েকে কিছু দিয়া যান নাই। আমি দিদির অবশিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিব! শরীরটা কেমন খারাপ বোধ হইতেছে যাই একটু শুইব।

* * *

ভগবানের রাজ্যের যে কি নিয়ম, তাহা অনেক সময়ে বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। এত আকাঙ্ক্ষার এত প্রত্যাশার বস্তু, যাহাকে

পাইবার জন্য সকলে এক ধ্যানে তাকাইয়াছিলাম, দশমাসের ভরসার দিন আর ফুরাইতে চাহিত না, সেই দশম মাস আসিল, মেয়ে আমাদের সকল আশার মুখে নৈরাশ্যের কালিমা লেপন করিয়া দিয়া এবারও একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিল। কেন এমন হয়? পুত্রের সাধ? শুধু সাধ নয়—একটা বংশ কেবল কাঁদি কাঁদি কন্যা ফলিলেই রক্ষা হয় না। পুত্রও যে চাই। আমার মেয়ের এতদিনের সাধ, জামাইয়ের এত আশা ভরসা, আমাদের এত প্রার্থনা আগ্রহ সমস্ত নিষ্ফল করিয়া দিয়া বিধাতা তুমি এ কি খেলাটাই খেলিতে বসিয়াছ প্রভো? মেয়ের আমার এই নিয়া চারিটী কন্যা। আহা এক একটা কন্যা যেন ফুটন্ত পদ্ম! তা হইলে কি হয়? এযে বাঙ্গালা দেশ। এখানে কন্যার বাজার নেহাৎ মন্দা, শুধু কি তাই? মেয়ের আমার এই চারিটী কন্যা প্রসবের অপরাধ চারিটা খুনের অপরাধের চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। খুনের আসামীর বিচারে আদালতে বিচারকদিগের মধ্যে অনেক সময় মতভেদ হইতে দেখা গিয়া থাকে এবং তাহারই ফলে অনেক সময় আসামীকে খালাস হইতে দেখা যায় কিন্তু হায় এই বাংলার সামাজিক আদালতে কন্যার জননীর অপরাধ সম্বন্ধে কদাচিৎ কাহারও মতভেদ হইয়াছে বলিয়া কেহ শুনিতে পায় নাই! মেয়ের এই চতুর্থ গর্ভেও কন্যা হওয়ার সংবাদে জামাইয়ের মুখে একটা অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা বিষাদ বা বিরক্তির ভাব নহে, অথচ তাহা যে কি, সেইটা এখনো আমি পরিষ্কার ধরিতে

পারিতেছি না। একটা ক্রোধ, জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার একটা উৎকট বৈরনির্য্যাতনের সুদৃঢ় সংকল্প, যেন বাবাজীর চোখে মুখে প্রতিফলিত হইতেছিল! আমি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম, আমার এমন মনে হইতে লাগিল, জামাই যদি এখন মেয়েকে হাতের কাছে পায় তবে টুঁটি টিপিয়া খুন করিতেও বোধ হয় দ্বিধা বোধ করিবে না। ভগবান্ তুমি এত বড় আশায় নিরাশ করিয়া কেন এই পরিবারের সকলেরই মুখ ম্লান ও হৃদয় বেদনাভারাক্রান্ত করিলে? আকস্মিক নৈরাশ্যের বেগ জামাইকে অতিমাত্র কঠোর ও বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। আহা মেয়ের আমার কতনা কষ্ট! কত না বেদনা, কত না আশঙ্কা, কত না নৈরাশ্য!—নাঃ ঠিকই করিয়াছি, আমি আমার মেয়েকে সুখী করিব। জামাইকে বিষয়ের অর্দ্ধেকটা ছাড়িয়া দিব। নহিলে বিষয়ের দুশ্চিন্তায় যদি ওর মাথা খারাপ হইয়া যায়, তবে আমার মেয়ের কি উপায় হইবে? এই ফুটন্ত পদ্মের পাপড়িগুলিকে আমি শুকাইতে দিব না,—দিদি, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে যাহা করিয়া যাইবার সুবিধা পাও নাই, আমি তাহা করিব! করিব! করিব!

(নবীন বাবুর কথা)

ছাই ফেলাইতে নাকি অনেক সময় ভাঙ্গা কুলার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই এই আখ্যায়িকার শেষ অংশটুকু যত করুণই হোক্ আমাকেই বলিতে হইবে। যেহেতু আমার মত এমন হতভাগ্য সংসারশূন্য পরগলগ্রহের ছাই ফেলাইবার জন্যই জন্ম। ভাগ্যদোষে স্ত্রী, পুত্র ও গৃহহীন হইয়াছি, সুতরাং আমার হৃদয় নাই, স্নেহ মমতা নাই, দয়া মায়া করুণা এ সকল কোমল বৃত্তির সহিত নাকি সামাজিক নিয়ম অনুসারে আমার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না, কাজেই এ সকল নাই। এ হেন যুক্তিমূলে এই আখ্যায়িকার করুণ অংশটুকু পাষাণের মত স্পন্দহীন হৃদয়ে অশ্রু-বঞ্চিত চক্ষে ও বাষ্পাবরোধ শূন্য কণ্ঠে বলিয়া যাইতে হইবে। যাহারা সংসারে এক কথায় 'পরভাগ্যোপজীবী' আমার অবস্থা ঠিক তেমন ছিল না। এক সময়ে আমার সংসারে না ছিল এমন কিছু নাই। বাড়ী, ঘর, দাসদাসী স্ত্রী পুত্র কন্যা, মান ও সম্ভ্রম এ সকল কিছুরই অভাব ছিল না। বিদ্যা বুদ্ধিও ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমার বিদ্যাবুদ্ধি বা ধনসম্পদ কোন কাজেই লাগিল না। এ দেশের ধনবান্‌গণের বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান অসিবন্দুকধারী সিপাহীগণের হাতিয়ার সমূহের ন্যায় এই ভাগ্য-হীনের বিদ্যা বুদ্ধি বা ধন সম্পদ জীবনের আড়ম্বরপূর্ণ ভারবৃদ্ধিই করিয়াছিল, কোন কাজেই লাগে নাই। বিদ্যার চাপরাশ এখনো

নামের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ক্রিয়ার অভাবে ম্লান, ধন-সম্পদ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত, তাহা দ্বারা কোনও কারবার চলে না, আমার অভাবে কোনও ভাগ্যবানের হাতে অবশ্যই আসিবে। বাড়ী ঘর শ্রীহীন ও ভগ্নপ্রায় হইয়া যথাস্থানেই দাঁড়াইয়া আছে,—যদি কথনো সেই অঞ্চলে যাই তবে চোখের জলে সেই পৈতৃকভবনের পাদ-পীঠ ধুইয়া দিয়া আসি। সেই পরিত্যক্ত গৃহের প্রতি আমার কত যে মমতা, কত যে সুখদুঃখের স্মৃতি তাহার সহিত জড়িত, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানে আর—স্ত্রী, পুত্র কন্যা! উঃ দারুণ কলেরার একটা গ্রাসে তাহারা একইদিনে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। যে দিন স্ত্রী পুত্রকন্যার সদ্যঃশোক হৃদয়ে বহন করিতে অক্ষম হইয়া দিদির স্নেহাঞ্চলের নীচে একটু জিরাইয়া লইবার জন্য পীরগঞ্জে যাদববাবুর বাসায় আসিয়া দাঁড়াইলাম—জানি না বিধাতার সেই প্রেরণার মূলে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল,—দিদির স্নেহের কোলে—মুখ লুকাইয়া অনেক কাঁদিলাম দিদি আমায় কিছু কালের জন্য তাঁহারই কাছে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আটকানেই যে আমার চিরকালের বেড়ি হইবে তাহা সেদিন কেন অনেক দিন পর্য্যন্তই বুঝিতে পারি নাই। একমাত্র ভাগিনেয়ী চিন্ময়ীর মাতা ও শিশু চিন্ময়ীকে রাখিয়া দিদি আমার একদিন হঠাৎ হার্টফেল করিয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। দিদির এই মেয়েটী ছাড়া সংসারে আর কেহ ছিল না। তিনি এই মেয়েটীর মমতায় এতদিন জামতার গৃহেই বাস করিতেছিলেন। জামাতা যাদব বাবুও তাঁহাকে

মাতার মত ভক্তি করিতেন। জামাতার গৃহে বাস করা, সাধারণের চক্ষে জামাতার শ্বশুর গৃহে বাস করা অপেক্ষাও কষ্টকর সন্দেহ নাই, কিন্তু যাদববাবুর চরিত্রগুণে দিদি একদিনের জন্যও মনে করিতে পারেন নাই এটা তাঁহার পরের বাড়ী জামাতার গৃহ। দিদির মৃত্যুর পরে আমি আবার ভগ্নহৃদয়ে দ্বিগুণ আহত হইয়া সুদূর হরিদ্বার অঞ্চলে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সংসারের প্রতি কেমন একটা অনাস্থা আসিয়া আমাকে দিন দিন কর্ম্মস্পৃহাশূন্য একটা অথর্ব্ব গোছের করিয়া তুলিল, ভাগিনেয়ী এবং যাদববাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না,—তাঁহাদের ব্যক্ত অনুরোধ ও নাতিনী চিন্ময়ীর প্রতি স্নেহপরবশ আপন হৃদয়ের অব্যক্ত অনুরোধে অগত্যা পীরগঞ্জই আমার স্থায়ী আবাসে পরিণত হইয়া উঠিল, আমি রহিয়া গেলাম। যাদববাবু আমাকে যথার্থ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। ভাগিনেয়ীর কাছে মায়ের আদর পাইয়া এবং শিশু-সন্তানের অভাব-ক্ষত স্থানটা চিন্ময়ীর স্নেহ মমতার প্রলেপে অনেকটা আরাম হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, আমি সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত প্রাণে সেই অবধি যাদববাবুর আবাসে অন্নধ্বংস করিয়া আসিতেছিলাম। আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান যাদব বাবুই করিয়া থাকেন, আমার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। আমি শুধু আছি এইত আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী!

অদৃষ্টের দুঃখ কেহ দূর করিতে পারে না। চিন্ময়ীর বিবাহ হইয়া

গেলে কিছুকাল পরে ভাগিনেয়ীটীও পরলোক যাত্রা করিল। আমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়া ও একমাত্র চিন্ময়ীর ক্ষীণ মমতায় আবদ্ধ হইয়া রহিল। চিন্ময়ী তখন সংসারে সবেমাত্র পৌঁছিয়াছে। স্বামীর সঙ্গে তখনও হৃদয়ের বিনিময় হয় নাই, পিতার অগাধ স্নেহ ও এই হতভাগার অক্লান্ত মমতাপূর্ণ সেবায় চিন্ময়ীর হৃদয় ক্রমে মাতৃবিয়োগ-জনিত শোকের তীব্রজ্বালা বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারই মধ্যে জামাতা বাবাজীর আবির্ভাব। তাঁহার ক্রমপ্রবৃদ্ধ আক্রোশের শাণিত ছুরিকা চিন্ময়ীকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই সরলা বালিকা স্বামীর লুব্ধ স্বার্থপর হৃদয়ের ক্রমপরিণতির ক্ষীণ আভাস পাইয়া তখনই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার কলিকাতা গমন, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পীরগঞ্জে আগমন, শ্বশুরের বিবাহ, এবং বিবাহের মূলে নিজের পুত্র সন্তানের অভাব, অধিকন্তু ক্রমাগত কন্যা সন্ততির বিভীষিকা, ইত্যাদি বিষয় আপনারা শুনিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু নিজের পুত্রসন্তান না হওয়ায় শ্বশুরের পুনর্ব্বার বিবাহ করা, এবং ইহার পরিণামে যে শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকার হইতে ভবিষ্যতে একেবারে বঞ্চিত হওয়ার অতিমাত্র মর্ম্মান্তিক সম্ভাবনা, এই কয়টা বিষয়ে জামাতার চিন্তা প্রথমে বিরক্তিতে পরে শ্বশুর ও পত্নীর প্রতি দারুণ বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষের ফলে আমার স্নেহময়ী সরলা নাতিনী চিন্ময়ীকে যে কি দারুণ মনঃকষ্ট নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে এখনো ততোধিক মনোবেদনায়, অভাগিনী পাগলের মত চীৎকার করিয়া আকাশ কাঁপাইয়া তুলিতেছে

তাহার সংবাদ আপনারা এতটুকুও পান নাই। চিন্ময়ী সে সকল কথা বলে নাই ; পতিপ্রাণা সতী, স্বামীর নিন্দা করিতে পারে না, তাই তাহার কাছে আমরা একদিনও সে সকল কথা শুনিতে পাই নাই। অশ্রু ও ম্লান মুখচ্ছবি যতটা সংবাদ দিতে পারিয়াছে আপনারা ততটাও জানিতে পারেন নাই। হা লোভ! হা পুরুষের অবৈধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা!

জামাইটী উচ্চশিক্ষিত না হইলেও অশিক্ষিত বলিতে পারি না। বিশেষতঃ সে ভদ্র ঘরের সন্তান। তাহার এ লোভ কেন হইল? পূর্ব্বে সে এত লোভী বা ভয়ানক গোছের লোক ছিলনা। যাদব বাবুর জন্য সে চিন্তা করিত, আমাদের জন্য দুঃখ করিত, চিন্ময়ীকে ভালবাসিত। চিন্ময়ীর এক একটী কন্যা প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরাজ্যে এক একটা খুব ধ্বংসকারী ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা আমি খুবই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করিয়া শ্বশুরের ঐশ্বর্যের সঙ্গে 'ঠকর' দিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাকে কলিকাতা টানিয়া লইয়া যায়, কিন্তু সেখানে বুদ্ধির দোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সে যখন পীরগঞ্জে ফিরিয়া আসিল তখন হইতেই তাহার মানসিক গতি অন্যপথে পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন এবং কন্যাগুলির ভবিষ্যৎ 'পার' করিবার আশঙ্কা তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছিল, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার দ্বারও তখন একরূপ উদ্ঘাটিত। পুত্রহীন শ্বশুরের অতুল ঐশ্বর্য্য ভাগ্যান্বেষী জামাতার চোখের সম্মুখে

মোহজাল বিস্তৃত করিয়াছিল। আমি বেশ লক্ষ করিয়া আসিয়াছি জামাতা তখন সেই একই নেশায় বিভোর! চিন্ময়ীর প্রতি ব্যবহারের কঠোরতা ঠিক সেইদিন হইতেই বেশ করিয়া আরম্ভ হইয়াছে, যেদিন অভাগিনী সকলের আশায় ছাই দিয়া তৃতীয় কন্যার জননী হইয়াছিল, —এবং যেদিন যাদববাবু তাহার এবং আমার অনুরোধে দ্বিতীয় বার দারগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাদববাবুর দারপরিগ্রহের মূলে চিন্ময়ীকে দেখিতে পাইয়া জামাতার ক্রোধ ও জিঘাংসা যেন আরও বাড়িয়া উঠিতেছিল ; আর সেই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূলঘাতিনী নূতন শাশুড়ীর প্রতি তাহার যে কি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল তাহা আমি আর চিন্ময়ী ছাড়া সংসারে কেউ জানিতনা। চিন্ময়ী সেইজন্য স্বামীকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছে। নিরপরাধ সৎমার প্রতি বিদ্বেষ দূর করিবার প্রয়াস করিয়া সে অনেক নির্য্যাতন নীরবে ভোগ করিয়াছে। সৎশাশুড়ী অর্থাৎ নূতন গিন্নি জামাইকে যত আদর যত্ন করিতেন জামাইবাবুর মানসিক বিদ্বেষ ততই যেন লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া নিস্ফল রোষে নিজের রক্ত নিজে লেহন করিতে থাকিত। এ বিদ্বেষ এ জিঘাংসা কেন যে এত বাড়িয়া উঠিল, কিসে ইহার নিবৃত্তি হইবে সেই ভাবনা ভাবিয়া চিন্ময়ীর দেহ কালি হইতেছিল। সে একদিন ভীত হইয়া আমাকে চুপি চুপি বলিয়াছিল, “দাদা মশায়, মা যেন কারুর অষুধ বিষুধ না খায়, আপনি বারন করিয়া দিবেন।” আমি তাহার অকারণ অলীক আশঙ্কায় সহসা চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, হায় রমনি



তোমরা পুরুষ চরিত্রকে এতটা আয়ত্ত করিতে শিখিয়াও ইহাদেরই হাতে এমনতর লাঞ্ছিতা হও? আর আমাদের পুরুষ? তাহারা পরিণত বুদ্ধির অভাবে সরলতার ভাণে কুচক্র জাল ভেদ করিতে না পারিয়া সংসারের বহুবিধ জঞ্জাল আপনার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া চিরজীবন অনুতাপ করিয়া করিয়া কাটাইয়া দেয়।

* * * * *

ইংরাজ রাজত্বের ফলে এদেশে দুটী মারাত্মক জিনিসের আমদানী হইয়াছে একটী নীতি, অপরটী আইন। কথাটা একটু বেখাপ ঠেকিবে সন্দেহ নাই, তবে আমার বর্ত্তমান ধারণা এইরূপই হইয়া গিয়াছে। আইন লইয়া যাঁহারা কারবার করেন, তাঁহারা জানেন, বুদ্ধিমান লোকেরা সকল কাজেই আইনের মর্ম্ম অনুসরণ করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন। যদিও সেই মর্ম্ম শুদ্ধ আইনের হিসাবেই অনুসৃত হয়, যথার্থ ন্যায়-ধর্ম্মের হিসাবে নহে। তাহার প্রমান এই যে এই কয়বৎসর যাদববাবুর দরবারে আরজির বর্ণনায় প্রধান বক্তব্য বিষয় শুনিয়া আসিতেছি, "বাদীর এই দাবি তামাদি দোষে বাধিত বটে"! "তামাদি"?—হাঁ আইনের মর্ম্ম তাই বটে!—উহার মারাত্মকতা সেইখানে—যেখানে ভদ্রসন্তানকেও এই আইনের শ্রেণীর মর্ম্ম বা ফাঁক্‌গুলি লইয়া আস্ফালন করিতে দেখিতে পাই, অথচ সেইজন্য তাঁহাদের লজ্জা ঘৃণা বা সংকোচের ভাবটুকুও উঁকি দিতে সাহস পায় না। আইন—মানুষকে এমনি পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়। আইনের—এমনি একটা মোহিনী শক্তি আছে যে তাহার সাহায্যে

সে ক্রমশঃ সমাজকে তাহার ছাঁচে ঢালিয়া, গড়িয়া পিটিয়া তাহারই উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই আইন ঘটনার অনুসরনে প্রযুক্ত হইতেছে না, ঘটনাগুলি বর্ত্তমানে আইনের অনুসারে রূপান্তরিত হইতেছে! ইহা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক অবস্থা বলিতে হইবে। আর নীতি?—তাহার দশাও প্রায় একইরূপ। নীতির অনুসরণ করা নীতিবাদী বা ধার্ম্মিকের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল, এখন দেখিতে পাইতেছি পাশ্চাত্য নীতির এদেশীয় ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই নীতির অনুসরণ না করিয়া নিজেদের অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে নীতির মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। নীতির জমকাল আবরণে আবৃত হইয়া অনেক অপকর্ম্মকেও সৎকর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেখা যায়। নীতির চাপরাশ যাহাতে আঁটিয়া দেওয়া হয় সে পুলিসের লোককেও একধাপ নীচে রাখিয়া আপনার মনে চাবুক চালাইয়া যাইতে পারে—তাহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহারও থাকে না! শুধু তাই নহে, মানুষ নীতির নামে অনেক অনীতির সমর্থন—করিতে বাধ্য হয়, নীতির অপব্যাখ্যায় নিজে প্রতারিত হইয়া নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না! নীতি যেখানে প্রবেশ লাভ করিল, সেখানে যথার্থ ধর্ম্ম বা ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল কিনা সেই চিন্তা করিবার অবসর না দেওয়াই পাশ্চাত্য নীতির মারাত্মকতা। নীতির এই মারাত্মক মোহে পড়িয়া আমাদের জামাইবাবুর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে! ফলে এই সোণার সংসার আজ

শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।—যাহা হৌক কথাটা আমাকে বলিতেই হইতেছে! জামাই বাবু একদিন সত্যসত্যই মনে করিলেন শ্বশুরের সম্পত্তি জামাতার না হৌক কন্যার হইবে না কেন?—পুত্র নাই বলিয়াই যে কন্যার হইবে এমন নহে পুত্র থাকিলেও কন্যাকে বঞ্চনা করিবার কি নীতি আছে? সেই "নীতি"। পুত্র ও কন্যা একই নিয়মে উৎপাদিত, একই স্তন্যে—একই অন্নে একই স্নেহ-মমতায় বর্দ্ধিত, তবে পুত্র অপেক্ষা কন্যা কিসে কম? কোন্ নীতি অনুমোদন করিবে কন্যা কম? বিশেষতঃ যাদববাবুর একমাত্র কন্যাইত তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী? এই সম্পত্তি যাদববাবুর কন্যার। সুতরাং আমার।—এই লোভ জামাই বাবুকে—নীতির পোষাকে প্রতারিত করিল;—সত্যই হৌক্ আর মিথ্যাই হৌক্ লোকে যদি কোন একটা জিনিষকে আপনার বলিয়া ভাবিয়া লয়, তবে তাহার প্রতি এমনই একটা মায়া বসিয়া যায় যে সে তাহা ত্যাগ করিতে গেলে যেন প্রাণত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই মনে করে। সেই বস্তুটী যে দখল করিতে আসে তাহার প্রতি সর্ব্বস্বাপহারীর মত ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, এবং তাহার প্রতি তীব্র জীঘাংসা লেলাইয়া দেয়। যাদববাবুর পুনর্ব্বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি জামাইবাবুর ভাবটীও ঠিক এই শ্রেণীর হইয়াছিল। জামাইবাবু মনে করিতেন শুদ্ধ মনে করা নহে আমাকে বলিয়াওছেন, যাদববাবুর বিবাহ করা ওয়ারিশ বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য যিনি আসিয়াছেন সেই

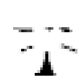
শাশুড়ীর প্রতি জামাইবাবুর জিঘাংসা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। শেষটায় যখন সৎশাশুড়ী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন তখন যে জামাই বাবুর কি অবস্থা দাঁড়াইল তাহা বর্ণনার অতীত। সেই জিঘাংসা এবং বিদ্বেষ আর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল সেইদিন, যেদিন চিন্ময়ী চতুর্থ গর্ভেও একটা মেয়েকে ধারণ করিয়া এতদিন সকলকে আশা ও নৈরাশ্যের দোলায় দোলাইয়া নিছক্ ফাকি দিয়া আসিয়াছে বলিয়া জামাইবাবু অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন! শুধু কি তাহাই? জামাইবাবু ভাবিতেছিলেন তাঁহার স্ত্রী অর্থাৎ চিন্ময়ী অন্তত: এই গর্ভেও যদি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিতে পারিত, তবে তাঁহাকে এমনতর সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। "সর্ব্বস্বান্ত" ? 'হ্যাঁ' তাহাই বটে! অপুত্রক যাদববাবুর যথাসর্ব্বস্বের অধিকারী একমাত্র তাঁহার কন্যা চিন্ময়ী, জামাইবাবুর এই ধারনা অনেক দিন হইতে জন্মিয়াছিল সেই ধারনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এতদিন যাদববাবুর সকল ঐশ্বর্য্যের ভবিষ্যৎ অবিসংবাদী ওয়ারিশ বলিয়া নিজকে মনে করিয়া আসিতেছিলেন, সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—এ বালাই কোথা হইতে জুটিল? তাও আবার সে অন্তঃসত্ত্বা এইটা দশম মাস। যদি ছেলে হয়! হা ভগবান্ তুমি মানুষকে এমনতর বঞ্চনা করিবার জন্য কত জঞ্জাল যে সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ!—এই সকল চিন্তার বাহ্য অভি-ব্যক্তির সহিত একসময়ে এ অভাগার সম্পর্ক না ছিল এমন নহে! আমি চিন্ময়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত, বিশেষতঃ তাহাদের প্রতি

অতিমাত্র স্নেহশীল, জামাইবাবু এই বাড়ীর মধ্যে শেষট আমাকেই তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ বলিয়া মনে করিয়াছেন। আপন এখানে তাঁহার নাকি কেউ আর ছিল না, যাদবব ও নহেন। আত্মাবোধশূন্য চিন্ময়ীও নহে।

কি যে করিব, কি করিয়া যে সে মর্ম্মস্পর্শী উপসংহারের সম্মুখীন হইব ভাবিয়া পাইতেছি না। বলিতে যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, চক্ষু ফাটিয়া শোণিত প্রবাহ ছুটে, বক্ষের স্পন্দন স্থগিত হইয়া পড়ে! উঃ! সেই মর্ম্মভেদিনী কাহিনীর একএকটী বর্ণ যেন শোণিত রঞ্জিত! নাঃ, আমি পারিব না, আমাকে সংসারশূন্য 'ভবঘুরে' দেখিয়া যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন আমি স্নেহ মমতাহীন শুষ্কহৃদয় একটা জানোয়ার বিশেষ,—তাঁহাদের ভ্রম, মহাভ্রম! ওগো আমি মানুষ, মানুষের আবাসে, মানুষের সমাজে বাস করি—স্নেহ মমতার জ্বলন্ত প্রমান এতদপেক্ষা বেশী কিছু থাকিতে পারে কিনা জানি না। ইতঃপর মৃত্যু আমায় তাহার যে করুণ ভীষণ মূর্ত্তি দেখাইয়া গিয়াছে, আমি তাহার সেই চেহারাই আজিও ভুলিতে পারিলাম না, মৃত্যুর এই নূতন চেহারা আমার চোখ ঝলসাইয়া দিয়াছে, হৃদয় দলিয়া টুঁটি টিপিয়া মর্ম্মের মর্ম্মস্থান পিষিয়া দিয়া—দানবের মত—অট্টহাস্তে চলিয়া গিয়াছে! ওগো আমি বলিতে পারিব না,—উঃ কি ভীষণ হত্যা!

* * * * *

জামাতার জুলুম



রাত্রি সেদিন বারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমার ভাগিনেয়ী অর্থাৎ ন গিন্নি ক্রমাগত তিন দিন প্রসব বেদনার দরুণ কষ্ট ভোগ করিয়া একটুমাত্র ঘুমাইয়াছে দেখিয়া আমি ঝিদের সতর্ক করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া একটু চোখ বুজিয়াছি। নূতন গিন্নির এই প্রথম গর্ভের ক্রমিক তিনদিন ব্যাপিয়া বেদনার বার্ত্তা সহরে যাদববাবুর হিতৈষী-বর্গের মধ্যে একটা আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। সহরের ডাক্তার কবিরাজ কেহ বাকি নাই, সকলেই আসিয়া নূতন গিন্নিকে দেখিয়া যাইতেছেন, ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ কেহ ঔষধ দিতেছেন। জামাই বাবু ঘরে বসিয়া বেশী সময় দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকেন, কি ভাবেন জানি না, যখন বাহির হন, তখন তাঁহাকে দেখিলে ভয় হয়। চোখদুটী জবাফুলের মত লাল, চুলগুলি খাড়া, মুখে অস্বাভাবিক সংকল্পের দৃঢ়তা অঙ্কিত!

রাত্রি তিনটার সময় বাড়ী মধ্যে একটা ক্রন্দনের রোলের মত শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া নূতন গিন্নির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম মা আমার যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! মুখ খানি কাল হইয়া গিয়াছে, ভাসা বড় বড় চোখ দুটী বসিয়া গিয়াছে, ঠোঁট দুটি কাল, নাক ঈষৎ হালিয়া পড়িয়াছে। মা আমার অস্ফুট চীৎকারে দারুণ যন্ত্রণার আভাস প্রদান করিতেছিল, কিযে যাতনা, কিযে অস্বাভাবিক জ্বালা তাহা মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। মুখ দিয়া লালা নির্গত হইতেছিল! চিন্ময়ী মাটিতে লুটাইয়া চীৎকার করিতেছিল। যাদববাবু মাথায় হাত দিয়া একটু দূরে বসিয়াছিলেন, চাকর দুইজন

ডাক্তারের বাসায় ছুটিয়া গিয়াছে। উঃ! কি ভীষণ দৃশ্য। না আমায় মাপ করুন, আমি আর বলিতে পারি না। মাগো! লক্ষ্মি—উঃ! ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রি ১টার সময়ে মা একটু কোঁকাইতেছিলেন শুনিয়া জামাইবাবু আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়াছিলেন জামাইবাবুকে দেখিয়াই সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছিল, কয়রাত্রি জাগরণে তাহার নাকি চোখে ঘুমের পাহাড় নামিয়াছিল। তবু সে সতর্ক মানুষ বলিয়া একটু জাগিয়া দেখিল জামাইবাবু ঘরে নাই এবং একটু পরেই এই আর্ত্তনাদ। চিন্ময়ী এই সংবাদ শুনিবামাত্র মেঝেয় মাথা খুঁড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল।—মার আমার কথা কহিবার শক্তি ছিল না, ইঙ্গিতে যাদববাবুকে ডাকিলে, তিনি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে স্ত্রীর শিয়রে আসিয়া বসিলেন। গিন্নির ইঙ্গিতে পা দুখানি মাথায় তুলিয়া দিলেন। চিন্ময়ী ক্ষুদ্র মেয়েটীর মত তাহার বুকে ঝাপাইয়া পড়িল? সেই মূহুর্ত্তে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সতী সাধ্বী—ওঃ! ওঃ! ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন শিশুটী জীবিত, কিন্তু জননীর দেহ হিমবৎ শীতল!—তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে! জানালার ফাঁক দিয়া প্রভাতের আলো আসিয়া গিন্নির মৃত্যুমলিন মুখের উপর পড়িয়াছে! মুখের দিকে তাকাইয়া ডাক্তার চমকাইয়া উঠিলেন এবং ইহাকে কোন স্বতন্ত্র ঔষধ কেহ দিয়াছে কিনা, তাহা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আপন মনে ঔষধের ফাইলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন,

শঙ্কা মালিসের ঔষধ যদি কেহ ভুলে খাওয়াইয়া থাকে! কিন্তু ঐ গ্লাসের উপর যখন হাত পড়িল অভিজ্ঞ ডাক্তার তখনই বুঝিয়া লইলেন এইমাত্র রোগী একগ্লাস তীব্র বিষ পান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে! জানিনা ক্রোধে উন্মাদের মত জামাইবাবুর ঘরের দিকে ছুটিয়াছিলাম কেন?—যাদববাবুর হস্তাকর্ষণে ফিরিয়া দেখিলাম শিশুটীর পরীক্ষা কার্য্যে ডাক্তার ব্যাপৃত—কতক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন শিশুটী রক্ষা পাইবে। বিষের ক্রিয়া উহাতে তেমন প্রকাশ পায় নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকটা ঔষধ দিলেন। চিন্ময়ী তখনো তাহার সৎমার মৃত্যুশীতল বুকের উপরে —মূর্চ্ছার প্রভাবে আত্মহারা। সে তখন কত সুখী! যাদববাবুর অটুট ধৈর্য্যে জামাতার হাতে হাতকড়ি পড়িল না বটে কিন্তু কথাটা বড় গোপন রহিল না।

সতীলক্ষ্মীর চিতার আগুন নিভাইয়া আমরা যখন ঘরে আসিলাম তখন জানিতে পারিলাম জামাইবাবু নিরুদ্দেশ! যাদববাবু অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহার কোনও সংবাদ পাইলেন না। যাদববাবুর সোণার সংসার আজি শ্মশানের মত শূন্য বিষাদ ভারাক্রান্ত! মাঝে মাঝে নবজাত শিশু দু'টীর ক্রন্দন ও হাস্যের ধ্বনিস্রোতে সেখানে স্বর্গের দুই একটা ঝরা ফুল ভাসিয়া আসে;— আর তাহাই লইয়া চিন্ময়ীর শিশুগুলি লুকালুকি করিয়া বাড়ীটাকে— 'ভূতের বাড়ীর' অপবাদ হইতে মুক্ত রাখিয়াছে! আমি আর যাদববাবু এখন আর জামাই শ্বশুর নই! দুজনে দুটী মৃত্যুবান

বিদ্ধ হরিণের মত পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া একই স্থা ঘণ্টার ঘণ্টা বসিয়া কাটাইয়া দেই। তাঁহার মর্ম্মমথিত দীর্ ... আমার বুকের উপর আসিয়া ঝাপাইয়া পড়ে—আমি চোখের জলের ধারা দিয়া তাহাকে ছানিয়া ছানিয়া জমাট করিয়া তুলি—তাই লইয় আমরা নীরব রোদনের দীর্ঘপালাগুলি কোনও মতে অভিনয় করিয়া যাই। চিন্ময়ীর মুখের দিকে তাকাইলে সেখানে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের দুজনেরই বুক ফাটিয়া যায়! অথচ আমরা কাহাকেও কিছু বলিতে পারি না,—মাঝে মাঝে শান্ত, স্থির, যাদববাবুর মর্ম্মসাগর আলোড়িত করিয়া দিয়া অসহ্য বেদনায় চিন্ময়ী যখন 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তখন আমি পাগলের মত ছুটিতে থাকি! শৈলাহত প্রচণ্ড বাত্যার মত নিজকে সহস্রদিকে সহস্রধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া কেবলই ছুটিতে থাকি আর বক্ষঃ বিদীর্ণকারী অদম্য দীর্ঘশ্বাসকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে তাহাকে গলাইয়া দিতে চেষ্টা করি! উঃ!

সমাপ্ত।

